প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৪১

প্রচ্ছদশিল্পী : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক : মনোরঞ্জন সিংহ
সৃজনী/৬৭এ বেলগাছিয়া রোড/কলিকাতা-৩৭
মুদ্রাকর : সুধীরকুমার বসু
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস/৪১ অনাথনাথ দেব লেন/কলিকাতা-৩৭
ব্লক : ব্যানার্জী ব্রাদার্স

একমাত্র পরিবেশক :
মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

... ...

গতদিনে যা হারিয়ে গেছে তার জন্যে অনুশোচনায় আমি অরাজী, যা হারায়নি—স্বল্প ক্ষমতায় যেটুকু আমি ধরে রাখতে পেরেছি তাকে আজকের রঙে রাঙাতে আমার মন যায় না, যেহেতু তাতে আমূল রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রবল, তাতে 'নিখুঁত হত' এমন কথা কিছুতেই বলতে পারিনে। যদি বিশ্বাসের কথা বলি, তাহলে নিখুঁতত্ব সোনার পাথর বাটি, সে হয় না। বরং আদিরূপের ক্রম বিন্যাসে আমার অগ্রগতি পশ্চাদ্গতির চিহ্ন স্পষ্ট ; এবং একজন নবীন লেখকের পক্ষে ধারাচিহ্নের এ সান্ত্বনা আদৌ অল্প নয়।

অতঃপর বাছাই-এর কথা উঠবেই। কিন্তু নিজের 'পরে আমার বিশ্বাস অগাধ অথবা অবাধ নয় বলেই নিজের কানা ছেলেকে পদ্মলোচন নামে ডাকার ইচ্ছা শুধু প্রবাদ নয়, মমতান্ধ বলে সত্যও। সুতরাং.........
তাছাড়া অন্য কারো উপরে ভরার্পণের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আমি সরাসরি অন্য অনেকের অর্থাৎ আপনাদের সামনে রচনাগুলোকে উপস্থিত করছি ; সহৃদয় বিচারে বাছাই-এর কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে আমি মনে করিনা, বরং তাতে বাছাই সুষ্ঠু হবারই সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গতঃ প্রথম রচনার নামেই গ্রন্থের নামকরণ করেছি। আমার মতে নামটা সুন্দর, অর্থবহ। এবং এ গ্রন্থের বেশীরভাগ রচনাই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় 'দৈনিক যুগান্তরের' সাময়িকীর শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বিমল সহৃদয়তা আমার পাথেয়।

ত্রুটি নির্দেশ ও অশুদ্ধ সংশোধন করেছেন বন্ধুবর অমল বন্দ্যোপাধ্যায়॥

৯ পৃষ্ঠার ২১ লাইনে 'সত্যান্ধ'র স্থানে 'সত্যসন্ধ' ও ১২ পৃষ্ঠার ২৮ লাইনে 'সংসারের' স্থানে 'সংশয়ের' পড়তে হবে। এ ত্রুটি আমার॥

উৎসর্গ

রঘুনাথ গোস্বামী

উমা গোস্বামী

এই লেখকের

কলকাতার কুয়াশা

জনকণ্ঠের কলকোলাহলের, অতিব্যস্ত গাড়ী-ঘোড়ার, উল্লোল হৈ-হল্লার দ্রুত পরিবর্তনের পটভূমিতে ভোর হয় কলকাতায়। সে ভোর চিন্ময় অথবা হৃন্ময় নয়, সে ভোর শব্দময়। দিনে দিনে সেই সোরগোলের ভোর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। আমাদের শ্রুতি তাতেই অভ্যস্ত, আমাদের চোখও। বিছানা ছেড়ে উঠে ব্যস্ত মানুষের ছুটোছুটি দেখতে আজকাল ভাল লাগে। ভাল লাগে ক্রমবর্ধমান জনকণ্ঠের হৈ-চৈ-এর মধ্যে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হওয়া কলকাতার আকাশ, হিজিবিজি অলিগলি, চওড়া সড়ক, উঁচুনিচু ঘরবাড়ী, রঙীন রঙহীন মানুষ; সব-সবই। যদি কোনদিন ভোরে উঠে দেখি গাড়ী-ঘোড়া নেই, হৈ-চৈ নেই, চারিদিক জুড়ে যেন এক অবশ হয়ে যাওয়া নিষ্প্রাণ নির্জনতা, অমনি চমকে উঠি। কলকাতার জীবনে হরতালের ভোর ছাড়া এমন ভোরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প। হরতালের প্রত্যূষ মহানগরীর স্বাভাবিক চলায় ছন্দপতন।

এমনি আরেক ছন্দপতন কুয়াশাচ্ছন্ন কলকাতার ভোর। দিগ্‌দিগন্ত পুরু অবগুণ্ঠনের তলায় আত্মগোপন করে আছে; দৃষ্টি চলে না এমন অপরিচ্ছন্ন সাদা ঘন কুয়াশার আস্তরের নিচে কাছের মানুষও অস্পষ্ট, যেন অশরীরী এক অনুভবের অস্বস্তি। তখন মনে হয় অভ্যস্ত কোন জীবন-যাত্রা থেকে আমরা হঠাৎ দূরে সরে গেছি, অনেক দূরে। মনে হয় কোন এক আদিমতম সকালে দাঁড়িয়ে আমরা দুর্জ্ঞেয় বিশ্বের দুর্গম এক রহস্যকে অবলোকন করছি; অথবা রঙীন এবং রঙহীন যে জীবনপ্রবাহ আমাদের চোখে আমাদের অস্তিত্বের মতো সত্যি, তাকে ছাড়িয়ে আমরা যেন অতি অস্বচ্ছ পথে এমন এক অর্বাচীন এলাকায় এসে পড়েছি যেখান থেকে চোখ মেলে প্রতিবেশীকে ত নয়ই, এমন কি নিজেকেও নিজের কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়।

কুয়াশায় মোড়া কলকাতার অস্তিত্ব সত্যই অস্বস্তিকর। সভ্যতার যে জয়ধ্বজা উড়িয়ে আমাদের প্রত্যহের শোভাযাত্রা, প্রগতির যে ছাপ চোখে-মুখে মেখে আমাদের দৈনন্দিন অভিসার, যেখানে দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময়ের সেতু ডিঙোয় রাত্রি, মানুষের দুঃখ-বেদনা হাসি-কান্নাকে ঠাট্টা করে

দাঁড়িয়ে যায় সময়,—সেখানে প্রাগৈতিহাসিক কোন অস্বচ্ছ ভোর অতিকুশ্রী মুখ দেখার মতো বীভৎস, অস্বাস্থ্যকর।

এবারের শীতের কয়েকটি ভোর, তা কেন, প্রত্যেক শীতের এমনি কয়েকটি ভোরই আমাদের সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্যূষে টেনে নিয়ে যায়; অবশ্য কিছুক্ষণের—মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে! তার পরে সূর্যের সোনারোদ ঋজু-অঋজু রেখায় আকাশকে স্পষ্ট করে। কুয়াশা জলীভূত হয়ে রূপায়িত হয় শিশিরে। যথারীতি আমাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় স্বস্তি খুঁজে পাই; বিশ্রী আবহাওয়াকে পেরিয়ে আসার শান্তি।

প্রাকৃতিক জগতে ঋতুবন্ধের ফলে যে কুয়াশার জন্ম সে কুয়াশা রূপান্তরিত হয় এবং এক সময়ে সূর্যোত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে বিলীন হয়ে যায় শূন্যে। কিন্তু মানুষের মনের যে গোপন অন্তরালে নিত্যকার ভোর-সন্ধ্যে, যে গহন গভীরে দিন-রাত্রির আবির্ভাব, সে আকাশের অতি পুরু কুয়াশা কি উত্তাপে গলে? অথবা বিবেক দংশনে বাষ্পীভূত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়?

যে ঈর্ষা দ্বেষ লোভ পাপ নীচতা হীনতা প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সঙ্গী, যে বিকার বিকৃত বৈকল্য আমাদের দিনরাত্রির সহচর, যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে আমাদের মনোলোকে কুয়াশার সৃষ্টি, তার সমূহ বিনষ্টি কি আজও সম্ভব হয়েছে? অনৈতিহাসিক যে অন্ধকার যুগের আদিম-বৃত্তি-সর্বস্ব জীবন-যাত্রাকে আমরা দ্রুত পায়ে পিছনে ফেলে যে যুগের সঙ্গে একালের দূরত্বের পরিসরকে প্রতিদিন বাড়িয়ে বাড়িয়ে বুক ফুলিয়ে গর্বভরে বলছি—আমরা পায়ে পায়ে সভ্যতার শুচিস্মিত স্বর্ণাভ এক মিনারের চূড়োয় এসে দাঁড়িয়েছি; দূর করেছি সেদিনের বর্বরতা, আদিমতা, সেদিনের বন্যতাকে।

এ কথা কি যথার্থ অর্থে সত্যি বলে মেনে নিতে পারি?

একালের আমরা এখানে দাঁড়িয়ে অনেক দূর দেখি, বুঝিও অনেক। আমরা সংস্কারের, অতি প্রত্যয়ের ভয় কাটিয়ে সচেতন জীবন বোধে অনেক অগ্রসর। একালে পৃথিবীর পরিসর বেড়েছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ভূগোলের পরিধি হয়েছে আরও বৃহত্তর। ঘনিষ্ঠ হয়েছে পূর্ব পশ্চিমের, উত্তর দক্ষিণের। মানুষের দেয়া-নেয়া চলছে অবিরাম গতিতে, অথচ আমাদের যন্ত্রণার নিবৃত্তি নেই। এবং এ এমন এক যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা বিশ্বসংসারের মাধুর্যকে মলিন করে; আত্মার

কলকাতার

সৌন্দর্যকে অতি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা হয় না। বলি—এ মায়া, এ মতিভ্রম।

সচেতনতার বড়াই আমরা যতই করি, সংস্কারের বেড়াজাল আজও আমরা ছিঁড়তে পারিনি। তাই আমাদের পায়চারি ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীতে। আমাদের মন নিজেকে ছেড়ে দূরে, ঘরকে ছেড়ে বাইরে দেখতে শেখেনি। দশের এক হওয়ার লোভ আমাদের আছে, অথচ দশের এক হতে হলে নিজেকে প্রথমে ন'জনের মধ্যে এনে দাঁড় করানর প্রয়োজন সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায়, এ সত্যকে আমরা উপলব্ধি করিনি। যতই দিন বাড়ছে ততই যেন শুধু মাত্র নিজের প্রাণ বাঁচানকেই আঁকড়ে ধরেছি; জোরে ছুটছি আশ-পাশের প্রতিবেশীর সুবিধে-অসুবিধেকে পায়ে মাড়িয়ে। আমাদের এই অসহিষ্ণুতাই আমাদের যন্ত্রণার উৎস, আমাদের নীচতা-হীনতার মূল। ধৈর্যের সাধনা আমাদের নেই। এবং বলি একালেরও নেই অতি উন্মত্ততা কালের স্বভাবে। কালের প্রভাবে আমরাও উন্মত্ত হব তাতে সন্দেহ কি? অবশ্য এ-কাল এ দেশজ নয়; ভিন্‌ দেশ থেকে একে আমন্ত্রণ করে এনেছি আমরা। রামমোহন রায় উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সামগ্রিক প্রসারতার জন্যে যে দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে অতি দীর্ঘদিন আমাদের মানসিকতা এদেশের জল-হাওয়ায় বড় হয়ে ওঠেনি, পশ্চিমের ওমে আমাদের মনন উত্তপ্ত হয়েছে। এবং আমাদের চেষ্টা হয়েছে কি করে পশ্চিমের মতো হব জ্ঞানে বিজ্ঞানে সম্পদে শক্তিতে; নিজেদের মতো নয়। তাই দিনে দিনে আমরা অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে সরে গিয়েছি দূরে।

অনুকরণের স্পৃহা যখন তীব্র হয় তখন আপন পর জ্ঞান থাকে না। দীর্ঘ-দিন ধরে পশ্চিমিয়ানার অনুকরণ অনুশীলনের ফলে আমাদের মানসিকতায় এমন এক আশ্চর্য বোধের জন্ম হয়েছে, যা স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন বিশেষ জাতের নয়। বরং বলা যায় সংকর জাতের—যা ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়। এতে আমাদের স্ব-ত্ব নষ্ট হয়েছে, অথচ পর-ত্বকেও আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি।

পশ্চিমী সভ্যতার যে উজ্জ্বলতা আমাদের চমকে দিয়েছে, চোখ ধাঁধিয়েছে আমাদের, আমরা তার হঠাৎ আলোর চমককে বড় করে দেখছি। আমরা তার গভীরে ডুব দিয়ে তার ফলশ্রুতির ইতিবৃত্তের খোঁজ নিইনি। নিলে দেখা

যেত পশ্চিমের যে গতি আমাদের মুগ্ধ করেছে সেই গতির ফলস্বরূপ গত দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়েছে পশ্চিমের সাজান বাগান। পচাগলা শবের দুর্গন্ধে কলঙ্কিত হয়েছে পশ্চিমের আবহাওয়া এবং আরও এক কলঙ্কের প্রস্তুতি চলছে—তার প্রমাণ প্রত্যহের সংবাদপত্রের সংবাদ। আমরা এদিকটাকে আড়াল করে পড়ি-মরি ছোটাকেই বড় করে দেখেছি, তাতে ফল হয়েছে এই যে, আমরা গতির ভান করতে অভ্যস্ত হয়েছি; অথচ আমাদের জীবনে গতির ভাব আসেনি।

অতি তৎপরতা আমাদের স্বভাব ধর্ম নয়। একটু ঢিলেঢালা, একটু রয়ে বসে চলা আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের শোয়া-থাকার ঘর হলেই চলে না, একটু উঠোন, চওড়া ছাদ, আশেপাশে মাঠ, একটু আলো-হাওয়া না পেলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি। অথচ আমাদের চেষ্টা আমাদের অস্তিত্ব-ধর্মকে অস্বীকার করার। হয়তো সে অতিক্রম সম্ভব, অবশ্য তার আগে প্রয়োজন আবহাওয়ার, জলবায়ুর পরিবর্তন। যে দেশে আমাদের জন্ম, যে মাটিতে ভর করে আমরা দাঁড়াই তার কোমলতা আমাদের স্বভাবে। সে স্বভাবকে অতিক্রম করতে হলে জল-মাটির স্বভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। অথচ আমরা সে সম্বন্ধে ভাবিনি। তার ফলে আমরা হারিয়েছি বিশ্বাস, বদলে পাইনি অন্য কিছু। আর তাই পুরোন নীতিবোধ আমাদের কাছে হয়েছে অর্থহীন, কিন্তু নতুন কোন মূল্যবোধ আমরা তৈরী করতে পারিনি। আমরা জেনেছি পুরোন সংস্কার, অতিপ্রত্যয় সবই মিথ্যে; অথচ নতুন কোন নিয়ম-নীতি আমাদের জীবনে সত্যি, তা জানিনে। এমনি জানা-অজানার মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি আর ছুটছি।

এ ছোটার মনোবৃত্তি শুভ নয়, সুন্দরও নয়। যে যথার্থ শক্তির অধিকারী সে পাত্তা পাচ্ছে না, যে স্বল্প শক্তির অধিকারী সে শুধু তদ্‌বিরের জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই সমাজের সর্বত্রই এমনতর লোকের রাজত্ব—যাদের হাতে শক্তি ও ক্ষমতা, যার নির্বিশেষ প্রয়োগে এ সমাজে অন্তহীন বিশৃঙ্খলা, সীমাহীন দ্বন্দ্ব। এ দুঃখ অসহনীয়।

অধিকারীর অধিকার থাকে না, অনধিকারী সব শক্তির আধার হয় সে সমাজেই, যে সমাজের মানুষের মনোবৃত্তি যথার্থ উন্নত নয়; যারা মহত্তর মূল্যবোধের দীক্ষা নেয়নি। এ মানসিকতা মোটেই আধুনিক অথবা প্রগতিশীল নয়।

কলকাতার

এ মনোবৃত্তি আদিম, এ বর্বরতা। সচেতনতা তাকেই বলে যা স্বার্থেও অন্ধ করে না। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতাই সচেতনতা। পরিচ্ছন্নতার অভাবে আবর্জনা জমবে এ স্বাভাবিক এবং পশ্চিম আমাদের এ আবর্জনা জমে ওঠায় সাহায্য করেছে, এও মিথ্যে নয়।

মহাকালের ইতিহাসে দ্রুত চলতে পারার জন্যে আমরা সার্টিফিকেট অব মেরিট পাব কিনা জানিনে, তবে স্বধর্মকে অবহেলা করার জন্যে উত্তরপুরুষ যে আমাদের ধিক্কৃত করবে, এ সম্বন্ধে আমি নির্দ্বিধ। কারণ, যে যুগে যোগ্যের উদ্বর্তন হয় না, অযোগ্য দাঁড় থেকে হালে, হাল থেকে ধাপে ধাপে আরও উঁচুতে উঠে যায় অবলীলায়, সে যুগ কালের ইতিহাসে শুধুমাত্র অর্বাচীনতার ছাড়পত্র ছাড়া আর কিই বা আশা করতে পারে?

যথার্থ দেখা

যথেষ্ট গভীরতার সঙ্গে তন্ন তন্ন করে দেখাই যথার্থ দেখা। তাতে পূর্ব ধারণার বদল হয়, নূতন মূল্যবোধ জন্ম নেয়। এ দেখায় আমরা অনভ্যস্ত। তার প্রমাণে সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত তুলছি—বোধোদয় হবার ঢের পরেও 'সদা সত্য কথা বলা উচিত' এ ধরণের আপ্তবাক্য আজও আমরা মুঠো মুঠো স্নেহভাজনদের উদ্দেশ্যে ছড়াই, যা বাস্তবে নিজেরা মানিনে অথবা মানতে পারিনে। স্ব-অভিজ্ঞতায় জীবনকে আমরা যে ভাবে দেখি, স্বভাব দুর্বলতাবশতঃ সেভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারিনে। প্রতিপক্ষ যদি ঘোড়েল হয়, তাহলে প্রশ্ন তোলে। উত্তরে বলি—আমি যা করি তা নয়, যা বলি তাই কর। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা দেখি, ফল হয়েছে উল্টো। যা করি তারই দৃষ্টান্ত তুলে প্রতিপক্ষ ঘায়েল করেছে আমাদেরই।

পূর্বসিদ্ধ সব ধারণাই শুভ নয়। যেহেতু কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞজন বলে

গেছেন—এই-ই পথ, এটাই ভাল ;—সর্বযুগে সর্বকালে সেটাই ভাল হবে তেমন কোন নিয়ম নেই। যুগ পরিবর্তনে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকের বদল হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধারণারও। শাশ্বত সত্য হিসেবে যে সমস্ত কথাকে আমরা উল্লেখ করি তা তখনই শাশ্বত মূল্য পায়, যখন পরবর্তীকালে তাকে আমাদের অনুভবে মানিয়ে নিতে পারি, অন্যথা নয়।

স্কুল জীবনে মাস্টারমশায় প্রশ্ন করেছিলেন—রামায়ণের সবচেয়ে সুন্দর চরিত্র কে? দ্বিধাহীন উত্তরে সেদিন বলেছিলুম- রাম। এ উত্তর স্বচিন্তিত নয়, চাপান।

মা-বাবা নিত্যদিন কানের কাছে বীজমন্ত্রের মতো জপেছেন, আমাকেও জপ করতে বাধ্য করেছেন—এই ভাল, এই খারাপ। বুঝেছি সেদিন, ভাল হল তাই-ই যা বাবা-মা করতে বলেছেন; খারাপ হল সেগুলিই, যেগুলো করতে বার বার বারণ করেছেন। ফলশ্রুতি তাই মারাত্মক। যে ক্ষমতায় খারাপের থেকে ভাল, অসৎ-এর থেকে সৎ, এবং সাধারণের মধ্যে থেকে মহৎকে বাছাই করা যায় সে ক্ষমতা আমাদের জন্মায়নি। এর প্রমাণ এদেশের বিরাট জনসমাজ, অজস্র অভিজ্ঞতায় 'চাপান সত্য' মিথ্যে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বাঁধা বুলির বাইরে একটি পাও দিতে যারা রাজী নয়। পূর্ব ধারণা লক্ষ্মণের মন্ত্রপূত গণ্ডীর মতো আমাদের সমাজকে, বোধকে সীমায়িত করেছে, যেহেতু আমরা জানি গণ্ডীর বাইরে পা দেয়া মানেই বিপদকে কুলো বাড়িয়ে বরণ করা।

নিজেরা যা পারিনে, অন্যে করলে তাতে আমাদের জ্বালার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি। কিছুদিন আগে একজন প্রবন্ধকার তাঁর এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই বিশ্বকবি কিনা, এই প্রশ্ন তুলে যথেষ্ট যুক্তির মাধ্যমে (কিছু বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও) বলেছেন যে—'রবীন্দ্রনাথ শুধু আলোর দিকটাই দেখেছেন। কিন্তু জীবন শুধু ভালর সমষ্টি নয়, ভাল-মন্দের আলো-আঁধারের সমষ্টি। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্ধকার দিকটা সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন, সেহেতু তাঁর জীবনবোধ খণ্ডিত। তাঁর দেখা অসম্পূর্ণ।' কথাগুলোকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমার নেই। তা বলে রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি নন, একথা বলার মত জোরও আমি রাখিনে। প্রবন্ধকারকে এদেশের অন্ধ ভক্তের দল অভিসম্পাত দিয়েছেন,—কিন্তু আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন। কারণ সাহসের

সঙ্গে উল্টেপাল্টে দেখার সৎ চেষ্টা তাঁর আছে। যথার্থ দেখতে জানেন কিনা, সে প্রশ্ন পরের।

যে কোন ব্যাপারে বাহবা অথবা হাততালি দেওয়া আমাদের মজ্জাগত, যদি সে ব্যাপার আমাদের ধারণার (যা পূর্বসিদ্ধ) অনুকূল হয়। একটা কিছু তেমন রকমের করলেই হল, অমনি মাথায় তুলে নাচা আমাদের স্বভাব। যেহেতু নিজেরা কিছুই করিনে, তাই অন্যে মনের মত খড়কুটো ছিঁড়ে দুখানা করলেই শুরু করি ঘাস ফড়িংয়ের মতো তিরিঙ বিরিঙ লাফ। এই লেজের খেলা দেখে মুগ্ধ হবার মন আমার বেশ কিছুদিন হল মরেছে। তাই ঘরকুণো পায়রার বকম-বক্, আর পোষা ময়ূরের পেখম মেলা নাচে আমি মোহিত হইনে। যদি দোষ না নেন তাহলে বলি, আমরা সত্যিকারের বোদ্ধা নই। আমাদের মনের হাঁড়িতে রস নামক যে বস্তুটি আছে, সেটা রস নয়, তলানি। সেটুকুও ঘটস্থিতি থাকলে নিঙড়ে কিছু আসল বস্তু পাওয়া যেত কিন্তু কপাল মন্দ। কারণ তলানির অংশও অস্বাভাবিক স্বল্প। তাই সূক্ষ্মরসের কারবার দেখলেই আমরা আঁতকে উঠে বলি—কি সব ছাই পাঁশ, মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না। এদেশের লিখিয়েরাও তাই জনসমাজের হালফিলের অবস্থা দেখে চোখ বুজে ছাড়ছেন —'যা খুসী তাই'। আর আমরা পাঠকেরা তাই গিলে বলছি—'বা রে! বেশ লিখেছে'। লিখিয়েরা জানেন—তাঁরা সাধারণ মানুষের চাইতে কিছু বেশী বোঝেন—তাই বুঝেছেন এদেশে আর যাই চলুক সূক্ষ্ম কিছুর কারবার চলবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপমার হেরফের করেই পাঠকদের ইচ্ছের কথা বলি—'মোটা মোটা অলঙ্কার পরলে বাহার যদি না খোলে ত না খুলুক, উত্তমাঙ্গটা ত ভারী হবে! তাতে চলতে গিয়ে হাওয়ায় টাল সামলান যাবে—সে ও কি কম কথা!' সেজন্যে এদেশের লিখিয়েরা পাঠকদের মাথায় মুষল মারছেন—মুষল প্রসব করবে এই আশায়। অবশ্য সে আশা যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আমরা-আপনারা। বই কিনছি, সংস্করণ হচ্ছে। এমনতর দেশে রবীন্দ্রনাথকে ক'জনে বুঝেছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ প্রচুর। শুধু রবীন্দ্রনাথ মহাকবি একথা জেনেছি; আর সেই জানা কথার ঢাক পিটিয়ে চলেছি প্রতিদিন। সে ঢাক পেটানয় কেউ বাধা দিতে এলেই অমনি তেড়ে উঠেছি। আমাদের বোধ যে অপরিণত এতেও কি তা প্রমাণ হয় না?

রসের হাটের যারা গিনিপিগ, তাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যথেষ্ট চমক লাগিয়ে চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। আমরা চোখ বুজে বলেছি—হে জ্যোতির্ময়, তুমি দুয়ার ভেঙেছ। তুমি মহৎ।

বোধকে চোখ ঠেরে বিশ্ব সংসারের ধূলিকে অমৃত বলা সহজ। কিন্তু চোখ মেলে সে কথা উচ্চারণ করা খুব কঠিন। রবীন্দ্রনাথের মহত্ব বিচার করার জন্য যে রসের দীক্ষা নেবা প্রয়োজন, যে তৃতীয় নয়নের সাহায্য দরকার, সেই বিশেষ দৃষ্টি আমাদের অনায়ত্ত। তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে নয়, এমনি অনেককে মহৎ, মহাত্মা, মহাপ্রাণ শিরোপা দিয়েছি যথার্থ বিচার করে নয়, ভাবপ্রবণ জাতির দুরন্ত ভাবাবেশে। উল্টেপাল্টে দেখতে আমরা আঁতকে উঠি, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আমরা সঙ্কুচিত—যদি ঋষির ঋষিত্ব খর্ব হয়? যদি অন্ধকারে আলো পড়ে? তাহলে!

কিন্তু এ ভয় অমূলক। অন্ধকারে আলো পড়লেও যিনি যথার্থ মহৎ তিনি নীচে নামেন না। তাঁর গৌরব খর্ব হয় না। সে কী জীবনে, কী সৃষ্টিতে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতার কথা লিপিবদ্ধ করায় তাঁর মহত্ব নষ্ট হয়নি, অথবা ঋষি টলষ্টয় তাঁর যৌবনের অতিচারের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করায় একটুও ছোট হননি আমাদের কাছে। রুশো তাঁর জীবনের অন্তরঙ্গ অনুভবের কথা প্রকাশে অস্বাভাবিক ঋজু হওয়ায় খর্ব হয়েছে কি তাঁর বিরাটত্ব? অথবা শ, অতিচারী বলে কি হীন? শেক্সপীয়র যৌবনে প্রতিবেশীর হরিণ চুরি করেছিলেন; তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এক ভদ্রমহিলাকে অবৈধভাবে সন্তানের জননী করে অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁর পানিগ্রহণ করেছিলেন; —এজন্যে কি শেক্সপীয়র মহাকবি নন? এ-ধরণের অজস্র নজীর তোলা যায়।

শুধু একদিকে নয়, অন্যদিকের বিচারেও ওঁরা অগ্রগণ্য। তাই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে আমাদের মত আঁতকে ওঠেন না। যখন কেউ প্রমাণ করতে বসেন শেক্সপীয়র চোর, তাঁর রচনা তাঁর পূর্বজ লেখকদের রচনা থেকে চুরি; বার্ণাড শ'এর নিজত্ব কিছুই নেই, সবটাই ইবসেনের অনুকরণ; অথবা টলষ্টয় আর্টের অ-আ বোঝেন না; তখন কেউ ধর ধর, মার মার বলে চেঁচান না। বিচার করেন। অপেক্ষা করেন প্রমাণ-সিদ্ধ তথ্যের। এর ফলে নতুন দিকে আলো পড়ে, নতুন মূল্যায়নের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়। পরিবর্তনে আমাদের ভয়, অনুভব করা সত্বেও প্রতিকূল মন্তব্যে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত।

কলকাতার

আসল কথা হল, সজ্ঞানে দেখা। বহু বিচিত্র মানুষ, তাদের জ্ঞানের সীমানুযায়ী দেখার ভঙ্গীও বিচিত্র। কতভাবে যে দেখা যায় একটি জিনিসকে, তার কোন হিসেব নেই। একটি শিমূল ফুল কবির কাছে সৌন্দর্যের, বিপ্লবীর কাছে রক্তাক্ত হৃদয়ের, ভক্তের কাছে ঈশ্বরের সৃষ্টির ঐশ্বর্য স্বরূপ। আবার এটাই একজন সাধারণের কাছে ষাঁড়ের খাদ্যবিশেষ। পূর্বধারণা এ ধরণের দেখায় বাধা, নূতন মূল্যায়নে বিঘ্ন।

আমাদের চিন্তার জগতের একঘেয়েমি বা বৈচিত্র্যহীনতার কারণ, পূর্ব ধারণা। পূর্ব ধারণার পায়ে দাসখত দেয়া এ যেন আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু বলতে গিয়েই বলি—'উনি এ কথা বলেছেন, অতএব আপনারা তাই করুন।' অন্যের চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে, অন্যের কথা বলতে বলতে আমরা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে নিজের চোখে দেখা এবং নিজের মতো করে বলা অসম্ভব। কিন্তু সব দেশেই কিছুসংখ্যক ব্যতিক্রম থাকে। সবাই ঝাঁকের কই, একথা যথার্থ নয়। তাঁদের অসুবিধে অনেক। যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নিজের অনুভবকে, নিজের কথাকে এদেশে বলার সুযোগ নেই। জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এত সঙ্কীর্ণ যে বিশেষ রঙের চশমা ছাড়া খোলা চোখে আমাদের জ্বালার সৃষ্টি করে। আমরা বুঝতে চাই না জীবন তত্ত্ব নয়, চলমান প্রবাহ। এতে তৃষ্ণার পানীয় যেমন আছে, যেমন আছে জীবন আলো করা অফুরন্ত ঐশ্বর্য, তেমনি আছে পাঁক, খড় কুটো ময়লা,—অর্থাৎ আবিলতারও অন্ত নেই। সত্যিকারের জীবনদর্শী যিনি তাঁর পক্ষে সব সময়ে আবিলতাকে এড়িয়ে শুধুমাত্র ভাল জিনিসকে তুলে ধরা সম্ভব হয় না। যেহেতু মনোরঞ্জনের চাইতে সত্যে-আগ্রহ তাঁর বেশি। যিনি সত্যান্ধ তিনি মিথ্যের ফিরি করে বেড়াবেন, এ মনে করা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও।

আমরা যে দর্পণে নিত্যদিন মুখ দেখি সেটা কাচের। তাতে নিজেকে মনোহর মনে হয় বেশিরভাগ সময়েই। জীবনদর্পণে মুখ দেখার নাম আত্ম-সমালোচনা। সে দর্পণের সামনে নিজেকে দাঁড় করান বড় কঠিন। তাতে সব সময়ে নিজেকে মনোহর মনে হয় না বলেই এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। এই এড়ানর নাম পলায়ন। বিজ্ঞজন বিজ্ঞজনোচিত কায়দায় বলেছেন—'সত্য বল, অপ্রিয় সত্য নয়।' এখানে যে সত্য বলতে বলেছেন সে সত্যের আগে একটা কথা উহ্য আছে—সেটা হল 'প্রিয়'। 'জ্ঞান-বৃক্ষে'র ফল খাওয়ার

পর থেকে মানুষ যে জিনিস নিয়ে বেশি নাড়া-চড়া করেছে সেটা হল 'কথা'। দিনে দিনে কথার চর্চা করে মানুষ চিনে নিয়েছে অপার শব্দশাস্ত্রের চোরাগলি। কথার ব্যবহারিক কুশলতায় তাই তার মুন্সিয়ানা বচনাতীত।

কিন্তু সত্য সত্যই; তার প্রিয়-অপ্রিয় দুই শিরোপা কেন? এ দুটো মানুষ প্রয়োজনে দিয়েছে। এই প্রয়োজনে প্রয়োগকে ছাঁটাই করতে না পারলে আমাদের কল্পিত সুবর্ণ যুগ অনাগতই থাকবে। কায়দা করে সত্যের মধ্যে বিভাগ সৃষ্টি করেছে মানুষ। নিজেকে নিজে চোখ ঠারায় মানুষ কতদূর এগিয়েছে তার একটি মারাত্মক দৃষ্টান্ত এটা। আসলে সত্য বলার প্রযোজন যদি আমরা অনুভব করে থাকি, তাহলে প্রিয়-অপ্রিয়র প্যাঁচ খসিয়ে তাকে আলোতে আনতে হবে এবং নিজেদের দাঁড়াতে হবে তার মুখোমুখী।

১৯৭৮

রঙোৎসবের উৎস

সাজান বাগানে কচি পাতায় আলোর নাচ, আর ললিত-রুচি ফুলে রঙ্গনটী ভোমরাদের 'কাছ থেকে দূর' রচনার মহড়া দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। অবশ্য তার সমর্থন ছিল বাতাসের সমারোহে, পল্লবিত পাতা-ডালের ক্লান্তিহীন করতালিতে। শহুরে মন গুন গুন করছিল কবিতার ছন্দে। ভাবতে বাধেনি, সেই আদ্যিকালের বেয়াড়া বুড়ো তাঁতীটা অসময়ে বুনবার মন, রোদ্দুর, নরম রেশম, ঘাসরঙ মসৃণ সুতো আর পুরোন কিছু হাওয়া কিনে এনে তাঁরই অতি প্রিয় অভিসারিকার সাড়ীর দাবী মেটানর জন্যে তাঁতে বসে দ্রুত মাকু চালাতে সুরু করেছেন। ঠিক সেই সময়ে কুঞ্জবনে পাখীর মন-উন্মন ডাক শুনেছিলুম। দৃষ্টি ছড়াতেই ধরা পড়ল, কুঞ্জবনের পাখী সে আদলে; আসলে সে পোষা পাখী, খাঁচায় পোরা। স্মৃতিচারণে হদিশ পেয়েছিলুম তার। পাখীটা ছ ঋতুতেই ডাকে। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, এমন কি শীতেও। শহুরে পোষাকী সখের কাছে

কলকাতার

বুনোপাখী নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। পাখীর এতে যদি লজ্জা থাকত, তাহলে অসময়ে সে ডাকতে পারত না। অথবা এও হতে পারে, পাথুরে হিজিবিজির আড়ালে ছ ঋতুর রঙ্গ তার অগোচর তাই; নয়ত অনুভবের মন তার মরে গেছে বলেই যন্ত্রের মতো প্রাণহীন তার ডাকাডাকি। বরং বলি, একঘেয়ে দিনযাত্রায় বৈচিত্র্যের লোভে সে তার গলার সাত তারে সুর গাঁথে, আবেগের তাড়নায় নয়, অভ্যেসের প্রতি সহজ আনুগত্যে।

এবারের ফাল্গুনে, তার হৈ-চৈ-এর পেছনে একই কারণ কিনা কে জানে?

মহানগরীর ভাঁজে ভাঁজে এমনি শত লক্ষ বুনো মনকে কুড়িয়ে এনে, শহুরে লোহার খাঁচায় পুরেছি, রক্ষা করেছি সখে। মনে মনে বাহবা দিয়েছি নিজেদের 'দুর্লভকে সঞ্চয় করে রেখেছি, এমন সঞ্চয়ী আমরা'। ভেবে দেখিনি সঞ্চয়ের লোভে স্বভাবের নবীনতা মরে গেছে সেই কবে! যাচাই করে দেখিনি যা এনেছিলুম, আর যা আছে দুই-ই সর্বাংশে এক কিনা; যাকে পরখ করার পরেও নির্দ্বিধায় মনে হবে 'তুমি সে তুমিই'।

পরখ করে দেখার অনিচ্ছা আমাদের হাড়ে-মজ্জায়। নইলে ধরা পড়ত কুঞ্জবনের মন খাঁচার শিকেয় মাথা কুটে মরেছে। আর আমরা, কুশ্রী-কর্কশ নগর সোরগোলের ফাঁকে ফাঁকে বেসুরো ধ্বনিকে সুরধনী ভেবে সাময়িক সান্ত্বনা লাভ করেছি।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানগুলো যেন এমনি বুনো পাখী। যেহেতু সখ করে খাঁচায় পুরেছি, সেইহেতুই রক্ষার দায়। উৎসবের উৎস কোথায় জানিনে, অথচ ধারারক্ষায় তৎপরতার কমতি নেই।

ধরা যাক দোলোৎসবের কথা। দোলের দিনে জলরঙে, তেলরঙে, গন্ধমাখান রঙান ফাগে ধুলোর রেণুগুলো মরিয়া হয়ে ওঠে শহরের অলি-গলিতে। সারাদিন জুড়ে দায়-দায়িত্বহীন হৈ হুল্লোড়ে, উল্লাসের বিকৃত চর্চায়, উচ্ছ্বাসের রুচিহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় ভগবানের আসনও বুঝি টলে ওঠে। এ কি গতানুগতিক দিন যাপনের গ্লানিকে মুছে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা? না কি অনুষ্ঠান পালনে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা? কে জানে! হয়ত এই বেসামাল মত্ততার পেছনে আছে তথাকথিত অর্থে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রঙকেলীর অনুকরণের ইচ্ছা। অনেকে একে যৌবনের বাধাবন্ধহীন পুচ্ছ ওড়ান মনে করেন। কেউ কেউ মনে করেন, এ উৎসবের আবার উৎস

কি? এ হলো সামন্ততান্ত্রিক যুগের অলৌকিক ভোজবাজী, যা দিয়ে জনগণেশকে মাতিয়ে রাখা হত!

কিন্তু এ ত নানাজনের নানা রকম ধারণা। আসলে দোল কি? দোল হল তাই যে দুলুনীতে জগৎ সংসারের রঙের বদল হয়, প্রাণের নবীনতায় মর্তের ধূলি হয় অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণরেণু, আর অনুভবের সজীবতায় জীর্ণপত্র হয় মসৃণ সবুজপত্র। সেদিন সূর্যের গতি পরিবর্তিত হয়, ঋতুর হয় বদল। জীর্ণতার শেষে সেদিন যাত্রারম্ভ হয় নবসৃষ্টির। অঙ্কুরে পত্রে ফুলে বিগতের ক্লান্তি যায় মুছে, নতুন সৃষ্টির হয় প্রবর্তনা। ব্যবহারিক জীবনে বছর সুরু যদিও বৈশাখে, আসলে প্রকৃতির বর্ষ আরম্ভ হয় এই দোলের দিনে। যতদূর সম্ভব প্রকৃতি এই সময়ে ধারণক্ষমা হন বলেই হয়ত যাঁরা উৎসবের প্রবর্তনা করেছিলেন তাঁরা এ উৎসবের উপকরণ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন আবীরের। আবীর হল প্রজনন শক্তির প্রতীক। এ রঙ নিজের অঙ্গে, অন্যের অঙ্গে মাখানর মধ্যে অলিখিত প্রতিশ্রুতি ছিল সদাসচেতন সৃষ্টি ইচ্ছার। নতুন কর্মের, নতুন সমৃদ্ধির শপথ। কারণ আদিকাল থেকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মনের রঙে আকাশ রাঙাবে, খুশিতে সাজাবে এই বিসারিতপট পৃথিবী। এবং সেদিনের তাঁরা জানতেন এই স্বপ্নসম্ভবের শতযোজন সাগর ডিঙনর জন্যে প্রয়োজন হনুমানের বিশ্বাস, আত্মশক্তির সচেতনতা। তাই তাদের লক্ষ্য ছিল ক্লান্তিহীন সাধনায় সেই বিশ্বাসের স্তরে পৌছন। দিনে দিনে সে লক্ষ্য ভুলেছে মানুষ। নির্দ্বিধায় মানুষ বলেছে—'আমি আপনি আছি, আছে ভোগের উপকরণ বিশ্বময় ছড়ান, তখন কাজ কি সৃজনারম্ভের, উৎসবের, বৃহৎ লক্ষ্যের অতি গূঢ় তথ্যে? কি লাভ অন্ধকারে আলো ফেলে? তার চাইতে যে ধারা রয়েছে সম্মুখে—হোক সে লক্ষ্যবিচ্যুত, তবু এই-ই যথেষ্ট নয় কি?' কালে কালে ছড়ান মাদুরকে গুটিয়ে নেয়ার মতো নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে মানুষ সংকীর্ণ মানসিকতার স্বল্প পরিসরে এনে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে নিজেকে এবং নিজের ছায়াকে ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তার ফলে তার মধ্যে এসেছে ভয় দ্বিধা সংশয়। আজ মানুষ বিশ্বাসে কদম বাড়িয়ে অবিশ্বাসে ফেরে। সে ডুবতে ডুবতে ভাসে, ভাসতে ভাসতে ডোবে। কারণ সব সেতুই পেরোন যায়, এমন কি অতিধার ক্ষুরের সেতুও, কিন্তু সংসারের সেতু পেরোন বড় কঠিন। এ কি শুধু মনের দ্বন্দ্ব? আমি বলি, এ হল সত্যানুসন্ধিৎসার অভাবে সৃষ্ট ঘরে বাইরের সংঘাত। এর ফলে একালের

 কলকাতার

আমরা সেই মহৎ লক্ষ্যের আদর্শ স্তর থেকে নেমে এসেছি অনেক নীচে। আশেপাশের ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যে মিথ্যে হচ্ছে সত্য মূল্য, আর আমরা হচ্ছি লক্ষ্যভ্রষ্ট। নষ্ট হচ্ছে আমাদের রুচি, শুদ্ধি, মহৎ মূল্যবোধ। এতে বাঁচার মূল্য যাচ্ছে কমে, আমাদের দৈন্যের বিকৃতির কাছে আমাদের মনুষ্যত্ব হার মানছে পদে পদে। এ লক্ষণ অশুভ। তাই আমাদের প্রয়োজন উৎসের দিকে দৃষ্টি ফেরান। কারণ যে মাতৃজঠরে আমার আপনার জন্ম, অনুরূপ জঠরে জন্ম নেবে আমাদের উত্তর পুরুষ। সেও সেই জঠর। অতএব ধারা রক্ষার দায়ই শুধু আমাদের নয়, উৎসের দিকে চোখ ফেরানর দায়িত্বও আমাদের। যেহেতু সৃজনেচ্ছা আমাদেব বর্তমান, সেহেতু সৃজনারম্ভের তথ্যে আমাদের অনিচ্ছে সাময়িক আদর্শচ্যুতি বলেই ধরে নিতে হবে।

অবশ্যই আমার বিশ্বাস আমার সত্য। যেহেতু আমি মনে করি অমৃতের অধিকার মানুষের, কারণ অ েক অপমৃত্যু ডিঙিয়ে বাঁচার জোর তার আছে। তাই বলি, দোলোৎসবের মতো সমস্ত ধর্মীয় উৎসবের উৎসে আছে বৃহত্তর মহত্তর সত্য, যা জীবন ও জগৎকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়, আছে এমনতর নবীন সৃষ্টির আমন্ত্রণ। এবং আজকের এই অরাজকতার দায় ধর্মের নয; দায আমাদের স্বভাবের, বিকৃত রুচিব, আমাদের অপরিশীলিত আকাঙ্ক্ষার।

১৯৮৮

চোখ বুজলে এ সংসারে কে কার! স্ত্রী-পুত্র ধন-জন, বেঁচে থাকার সাত-সতের ঝামেলা কিছুতেই মাথা গলানর দায় রইল না, অথবা জবাব দেবার দায়িত্ব। তখন আপনি সেই ছিন্নবাঁধা পলাতক বালক, পরলোকের আদিগন্ত-প্রসারিত ফুটিফাটা মাঠের দাউ-দাউ-শিখা মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ে হিন্দোলিত ঋজু-দেহ বনস্পতির পল্লব ছায়ায় বসে যতক্ষণ খুশি মনের আনন্দে বাঁশি বাজান, কবিরা 'আগুন লেগেছে কোথা' বলে গলা ফাটালেও আপনার বাঁশি বাজান বন্ধ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। তখন আপনি কান এগিয়ে গান শোনার, গলা বাড়িয়ে চড় খাওয়ার, অথবা প্রাত্যহিক টানাপোড়েনের অতি অবশ্য প্রয়োজনে মুঠো মুঠো চুল ছেঁড়ার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। ভাবতে ভাল লাগছে বলেই লিখছি, তখন আপনি হয়ত ব্রহ্মলোকের সবচে' উঁচু টিলার 'পরে পা ছড়িয়ে বসে পরখ করছেন ভোরের কুঁড়ির অঙ্গাবরণ, অথবা রোদ্দুরের রেণুগুলোকে নিয়ে লোফালুফি খেলছেন, এমনি কতকিছু।

মৃত্যুর কথা তুলে নান্দীপাঠের কারণ, ঘুম মৃত্যুরই অনুজ। এতে দায় না ফুরলেও, সাময়িক দায়িত্ব ফুরয়। প্রমাণ, রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ।

লঙ্কার রাবণ যখন সীতা রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারে; লঙ্কার রাজকবি যখন জনে জনে ডেকে বলছেন : 'ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা' —তখনো কুম্ভকর্ণ ঘুমে। রামচন্দ্রের বানর সেনার লঙ্কার মাটিতে পদার্পণ, বিভীষণের রাক্ষসকুল ত্যাগ, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু, বীরবাহুর পতন, যুদ্ধের হৈ চৈ, এর কিছুই তিনি জানেন না। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সবাই যখন নাকানি-চুবানি খাচ্ছেন তখনো তিনি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। অবশ্য বাল্মীকি যুদ্ধের অবস্থাকে গায়ের জোরে অতিরঞ্জিত করে অকালে ঘুম ভাঙাতে বাধ্য করেছিলেন কুম্ভকর্ণের। নইলে রাবণ যদি ধীর স্থির ভাবে আরও কিছুদিন যুদ্ধ চালাতেন (বাল্মীকি চাইলেই পারতেন) সম্মুখ যুদ্ধ না হোক নচেৎ গরিলা যুদ্ধ, তাহলে কি রামচন্দ্র এত সহজে সীতা উদ্ধার করতে পারতেন? কেতাব বড় হয়ে উঠবে ভয়ে বাল্মীকি ভীষণ তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিয়ে এমন কেলেঙ্কারী

ঘটাতে বাধ্য করলেন। অকালে জাগালেন কুম্ভকর্ণকে। তাতেও বাল্মীকি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। সবংশে নিধন হল মুখপোড়া!

এই চুলদাড়ীওয়ালা কবিগুলো সর্বকালের মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্টের জন্য দায়ী। অথচ বলুন বাল্মীকি সারা জীবনে কি এমন রাজকার্য করেছেন, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা ছাড়া। আবার তারও অনেকাংশ নাকি বাল্মীকির নয়। তিনি কি সময় নিয়ে রাম রাবণের যুদ্ধকে আরও জমিয়ে তুলতে পারতেন না? একালের বলুন আর সেকালেরই বলুন, কবিকুলের মত অকর্মার ঢেঁকি আর কেউই নয়। অথচ আশ্চর্য এই, এঁরাই কাজের নামে লোক ক্ষেপান। এঁরা আবার নিজেদের বইয়ের নায়ক-নায়িকাগুলোকে হাজার সমস্যায় নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়েন হাততালির লোভে। অথচ নিজেরা সমস্যার ধার ঘেঁষেন না। সাধারণ লেখকদের কথা থাক, বাল্মীকি মহর্ষি হয়েও এই হাততালির লোভ ছাড়তে পারেন না। কুম্ভকর্ণ ভাগ্যের জোরে বছরে তিনশ' তেষট্টি দিনের ছুটি মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কবির হাতে পড়ে রেহাই পেলেন না। অবশ্য অকালে ঘুম ভাঙাতে বাল্মীকিকে কম কালি খরচ করতে হয়নি। ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ-মুরলী, নাকড়া-টিকারা, এমনকি সেকালের ফুলসেট ব্যাণ্ড পার্টির হৈ-চৈ-এতেও ঘুম ভাঙাতে না পেরে আনলেন শস্ত্রী, শাস্ত্রী, শূলী। অবশেষে ডাক দিলেন লাস্যময়ী নারীদের যাদের স্পর্শে মৃতও পুনরুজ্জীবিত হয়। বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধার সঙ্গে বলি, তাতেও কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙেনি—তিনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন মাত্র! রামায়ণের এই চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। আপনারা কি হলপ করে বলতে পারেন কুম্ভকর্ণ, সত্যই লঙ্কার মানুষ? আমার কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে তিনি এই মহাভারতেরই অধিবাসী।

বুদ্ধিমান পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকারা হয়ত ভাবছেন আমি নিশ্চয়ই অনিদ্রা রোগে ভুগছি, নইলে কুম্ভকর্ণকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছি কেন? আপনাদের অনুমান মিথ্যে নয়। আমি জেগে আছি বলেই আপনাদের কানের কাছে চিৎকার করছি এত জোরে, যেহেতু আপনারা ঘুমে—কুম্ভকর্ণের চাইতেও ঘন এবং গাঢ় ঘুমে। আপনাদের সেই জেগে ঘুমিয়ে থাকার কথাই আমার এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষে আগুন লেগেছে দীর্ঘদিন। আমাদের মত স্বল্প সংখ্যক বহুবার আপনাদের ডেকে বলেছে, 'আগুন লেগেছে হেথা'। আপনাদের কান থাকা সত্ত্বেও আপনারা সে কথা শোনেননি।

ইচ্ছে করে কালা সেজেছেন দায়িত্ব এড়ানর জন্যে। ভিন্‌দেশে যখন সৃষ্টির মহোৎসব চলছে তখন আপনারা একাকীত্বের বিষণ্ণ স্বর্গে বসে স্বপ্নে রাজা-উজির মেরেছেন। আপনাদের দাপটে ধান খই হয়ে ফুটেছে। আর দলাদলির কেনেস্তারা পিটিয়েছেন মরিয়া হয়ে। নিজের অক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে বেড়িয়েছেন, লাফিয়ে কুঁদিয়ে গলা বাড়িয়ে বলেছেন নিজের দৈন্যের, লজ্জার কথা। আজও তাই করছেন।

সম্ভ্রমবোধ যখন লুপ্ত হয় তখন পরের হাত ধরে চলতে বাধে না। কারণ বাজীমাৎ করার এর চাইতে সহজ পথ আর নেই। দীর্ঘদিন আমরা বৃটিশের হাত ধরে চলেছি, তখন অভাবের তাড়নায় হাত পেতে দাঁড়িয়েছি ভিক্ষাপাত্র হাতে: বলেছি: দাও। যতবার বলেছে 'মাফ কর', ততবার বলেছি 'মাফ নেই'। সে অভ্যেস আমাদের কাটান উচিত ছিল। দীর্ঘ তের বছর পরেও আমরা তা পারিনি। এখনো মুখ চেয়ে বসে আছি, গদীওয়ালারা দেবে আমরা পাত্র ভরে পাব। তাঁরা কোথা থেকে দেবে সে চিন্তা আমাদের নেই। দাবী না মিটলেই বলেছি, 'গদী ছাড়'। গদী ছাড়লেই যদি সমস্যা মিটত, বৃটিশরা চলে যাবার পরেও এই সমস্যা কেন? বৃটিশদের আমরা কি ঠিক এ কথাই বলিনি যে, তোমরা ছেড়ে দাও, দেখবে আমাদের দেশের ধানে আমাদের পেট ভরবে। দশ বছর পরেও সে পেট সেই খালিই থেকেছে, কেন? বলেছেন—'গদীওয়ালারা চুরি করছে, দু'হাতে লুঠছে।' ভাল কথা। এঁরা গদী ছেড়ে দিলে গদী দখল করবে যাঁরা তাঁরা লুঠবে না তেমন গ্যারান্টি আছে কি? ষাট বছর ধরে যাঁরা দেশবাসীর কাছে আদর্শের মডেল ছিল, তের বছরে তাঁরা যদি লুঠপাটে সিদ্ধহস্ত হতে পারে, তাহলে বিশ-ত্রিশ বছরের ঐতিহ্য যাঁদের তাঁরা মোহান্ত পুরুষ হবেন তার ঠিক কি? ভুল বুঝবেন না, আমি কোন দলের প্রচারে নামিনি, শুধু সত্য যাচাই করার চেষ্টা করছি।

আমি বলি, মূল ত্রুটি অন্যত্র। ইজমের ধোঁয়ায় যদি অন্ধ না হয়ে থাকেন, তাহলে ধীরচিত্তে চিন্তা করে দেখুন ত্রুটি কোথায়? এ কথা মানতে দ্বিধা নেই, আদর্শের জোর বড় জোর। আজকের গদীওয়ালাদের আদর্শও খুব কমজোরী ছিল না। কিন্তু তাঁদের এই পরিবর্তনের কারণ কি? আজ যাঁরা বলছেন, ওরা 'বড়লোকের পেয়ারের দল', তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, এত দিন আপনাদের বুদ্ধির ঘোড়া কোন্ মাঠ জরিফ করছিল? যে যাই বলুক, দোষ

আদর্শের নয়, দোষ আমার আপনার। কারণ আদর্শের ত্রুটি শোধরান যায়, কিন্তু নিজেদের ত্রুটি নিজে উদ্যোগী না হলে কিছুতেই শোধরান সম্ভব হয় না। আমরা পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতে অতিব্যস্ত বলেই নিজের ছিদ্র দেখতে পাইনে। এ আমাদের স্বভাব।

প্রথমে স্পষ্ট করি 'স্বাধীনতা' বস্তুটা কি? এ ছেলের হাতের মোয়া অথবা খুকুর হাতের চুষিকাঠি নয়। স্বাধীনতা, স্ব অধীনতা। কোনো আদর্শের অথবা দলের নয়, আপনার অধীন আপনি। এ অধীনতা যে কত বড় অধীনতা যে বোঝে সে বোঝে। বরং বলি, পরাধীনতা এ অধীনতার তুলনায় অতি নগণ্য। পরাধীনতায় নিজেকে শিক্ষিত করতে হয় না। সেখানে দাবী মানবে কি মানবে না সেকথা না ভেবেও দাবী উত্থাপন করা চলে। কিন্তু স্বাধীন যে সে অভাবকে সম্বল করে কম্বল দাবী করতে পারে না; দাবী করে না। এখানে মুখ্য প্রশ্ন সংগ্রামের, এবং সে সংগ্রাম অস্তিত্বরক্ষার। সে দায়িত্ব অন্যের নয়, নিজের। যেহেতু আমি স্বাধীন, সেহেতু আমার প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন করার দায়িত্ব আমার। আমাদের সে দায়িত্ববোধ জাগেনি বলেই আমরা এখনও পরমুখাপেক্ষী। স্বরাজ এসেছে, অথচ স্বাধীনতা নয়। যদি তাইই না হবে তাহলে আমরা বলছি কেন, ওরা লুঠছে। ওরা কারা? ওরা যদি সত্যিই খারাপ, গদী দখলের অধিকার দিয়েছে কে? কেন আপনারা উপযুক্তকে এই অধিকার দেননি—প্রশ্ন করতে পারি? আর যদি সৎ নয়ই, তাহলে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বলছেন না কেন তোমরা নেমে এস। ওদের বাধ্য করুন। আমি ত বুঝিনে, কেউই যাদের চায় না তারা কি করে বছরের পর বছর গদী আঁকড়ে থাকে?

বলেছিই তো মূল ত্রুটি অন্যত্র। সব চাইতে কঠিনতম অধীনতা, স্বাধীনতা। এ নিজের, নিজের বিবেকের, নিজের সৎবুদ্ধির অধীনতা। যদৃচ্ছ ওড়া যেমন চলে না, যদৃচ্ছ ভোগ করাও নয়। স্বাধীন মানুষ অর্জন করে ভোগ করে। আপনারা বলবেন, সে সুযোগ কোথায়? আমি বলি সুযোগ কেউ দেয় না, সুযোগ করে নিতে হয়। আমাদের সেখানেই দুর্বলতা। আমরা যদি পার্টি নায়কের মুখের দিকে তাকিয়ে কালব্যয় করি, সুযোগ কোন দিনই পাব না। কারণ প্রত্যেক দেশেরই প্রধান প্রধান পার্টির লক্ষ্য জনসাধারণকে, তাদের মনোভাবকে পুঁজি করে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে গদী দখল করা। ভেবে দেখুন আমাদের

প্রাত্যহিক জীবনে তাই-ই হচ্ছে কিনা? যে দল গদী দখল করেছে তাদের চেষ্টা নিরঙ্কুশ রাজত্ব চালিয়ে যাওয়া, যেন তেন প্রকারেণ। বিরোধী দলগুলোর লক্ষ্য জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে, অতিরঞ্জিত অভাব অভিযোগের ছবি তুলে ধরে সরকার পক্ষকে নাজেহাল করা।

পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসী যেখানে সেখানে এই ধরণের ঘটনা স্বাভাবিক। কিন্তু জনসাধারণের দায়িত্ব অন্যত্র। সাধারণ মানুষ আমরা বুঝি কম, জানিও কম। তাই যে বলে রাম তার সাথে আমরা গাঁটছড়া বাঁধি। এ আমাদের দৈন্য। দৈন্য কারণ, আমরা সমস্ত জিনিসকে ভাসা ভাসা জেনেই খুসি। গভীরে ডোবার পরিশ্রমে আমরা অরাজী, অথচ লোভ সাংঘাতিক।

সব সময়ে যদি ঝোল অন্যের পাতে ঠেলে মাংসখণ্ড নিজের পাতে টানার দিকে লোভ থাকে, তাহলে স্বস্তি শান্তির ব্যবস্থা করা কোনো পার্টিরই সাধ্যায়ত্ত নয়। গলিত আবর্জনার দুর্গন্ধ যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, সে সমাজকে মুহূর্তে সুস্থ করা সম্ভব হয় না। যেমন টি, বি, রোগী একদিনে সেরে ওঠে না। তার জন্যে চাই সুস্থ পরিবেশ। কোন দল বলল, কালই দেশের অভাব ঘুচিয়ে দেব, অমনি তাকে গদীতে বসিয়ে দিলেই সমস্যা মিটবে না, মিটতে পারে না। যদি নিজেরা নিজেদের সমস্যার গভীরে ডুবে তার তলস্পর্শের চেষ্টা না করি। যদি মনে করি এ দায়িত্ব যারা গদী দখল করেছে তাদের, তবে মারাত্মক ভুল হয়। ওরা করতে পারে যদি আপনি তাদের সাথে হাত মেলান। নইলে এমন কোন আদর্শ বা দলের ক্ষমতা নেই রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন করে।

নজীর তুলতে পারেন রাশিয়ার। আমিও বলি করেছে, পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসীর আওতায় নয়, হয়েছে প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরী নামক নব্যতন্ত্রের একটিমাত্র ক্ষমতাবান মানুষের অধীনে। যাঁর বিরুদ্ধতা করা সম্ভব হয়নি, অথবা যারা করেছে তারা মরে বেঁচেছে। বরং উল্লেখ করি পশ্চিম জার্মানীর কথা। গত যুদ্ধে তারা নিঃস্ব হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছরে তারা যা করেছে তার তুলনা মেলা ভার। এর পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রকর্তাদের চেষ্টা নয়, জনগণেশের উদ্যম।

আজ এদেশের সর্বত্র পুকুর চুরির ঢালাও ব্যবস্থা দেখে আমরা আঁতকে

উঠছি। পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে। চারিদিকে চুরি আর চুরি। যে যেভাবে পারছে লুঠে নিচ্ছে। সবাই ভাবছে এই ত সুযোগ। এ সুযোগে আখের গুছিয়ে নিই। এরা কারা? আমার আপনারই আত্মীয়। এবং নিজের বিবেকের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখবেন আপনি যদি এই ক্ষমতার অধিকারী হতেন, তাহলে আপনি কি করতেন? আখের গুছতেন না?

যখন অরাজকতা সুরু হয় তখন দল অথবা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে হয় না, সে অরাজকতা সবস্তরের মানুষেব মধ্যে সংক্রামিত হয়। সৃষ্টি হয় দলাদ.লর, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের। এ সুযোগে নেপোয় দই লুটবে তাতে সন্দেহ কি? সে নেপো যে দলেরই হোক। কারণ পড়ে-পাওয়া পনের আনা ছাড়তে পারে এমন সাধু লোক এ সংসারে সংখ্যায় বিরল হয়ে আসছে। তাই বলছি, রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিবিশেষের দোষ না দিয়ে আগে নিজের দৈন্যকে দেখতে শিখুন। আমি আপনি আপনাদের নিয়ে পার্টি। আপনাদের ভোটের উপরই কে ক্ষমতা দখল করবে, কি করবে না, তা নির্ভর করে। এবং আরও মোদ্দা কথা, কথায় ভুলে যদি কণ্ঠস্বরে আকাশ ফাটান তাতে গলার জোরের প্রমাণ হবে, সুস্থ সমাজ গঠিত হবে না। আমরা যে সুস্থ নই, একথা কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে?

দোহাই আপনাদের, এত বছর পরেও আপনারা যদি মনে করেন আমিও বাল্মীকির মতো আপনাদের মঞ্জুর করা ছুটি ফুরনর আগেই তড়িঘড়ি ডাকতে সুরু করেছি, তাহলে কাজ নেই কাঁচা ঘুমে জেগে; তার চাইতে লঙ্কা পোড়ে তো পুড়ুক।

এতদিন পোড়া সত্ত্বেও যখন অসংখ্য পুত্র-পৌত্র নিয়ে ঘর করা আটকায়নি, তখন এখনো আটকে থাকবে না। কিন্তু একটি কথা, দিনে দিনে আপনাদের বিছানায় অনেক ছারপোকা জমেছে। একবার বিছানা রোদ্দুরে না দিলে আর বেশিদিন জেগে ঘুমের ভান করতে পারবেন, তা ত মনে হয় না।

১৯৫৮

সংবাদপত্রের কল্যাণে দুরধিগম্য প্রান্তের প্রশ্নবোধক সংবাদটুকুও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, যেমন রেডিওর দৌলতে সৌরলোকে ছুটন্ত স্পুটনিকের 'ব্লিপ ব্লিপ' শব্দও শ্রুতিতে ধরা পড়ে। একালের কিছুই আর চাপা থাকে না। এমন কি কোন্ অখ্যাত গাঁয়ের পানাপুকুরের পাড়ের তাল গাছে ডাব ফলল, আম গাছে কাঁঠাল অথবা লাউ গাছে কুমড়ো, কিছুই না। অন্তঃপুরের অতি গোপনতম কেলেঙ্কারীর ঘটনাটিও না। ঘর ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে, বিশ্ব ধরা দিয়েছে আমাদের সঙ্কীর্ণ ঘরের চৌহদ্দীতে। আমরা উৎকণ্ঠায়, আনন্দে, বেদনায় বিশ্ব পরিক্রমা করছি মুহূর্তে মুহূর্তে। অবাক হয়ে ভাবি আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ করেছিলেন যে ভদ্রলোক পরলোকে বসে এখন নিজের বোকামীর জন্যে কি দুঃসহ যন্ত্রণাই না ভোগ করেছেন! তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন, তাঁর বহু ব্যয় করে ঘুরে দেখা জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যাবে আমাদের ষোল নয়াপয়সা ব্যয়ে অর্জিত-দৃষ্টি পরিক্রমা? হতে পারে সে খবরের অনেকটাই জলো, অর্থহীন। অবশ্য সত্যি বললে বলতে হয়, একালে জলো বা অর্থহীন কোন খবরই নয়, বিশেষ করে আমাদের পরিমিতিহীন কৌতূহলের কাছে।

কিছুদিন আগের একটি সচিত্র সংবাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খবরটি 'দি প্রবলেম চাইল্ড' শিরোনামায় স্থানীয় একটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এ সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় টোকিওতে। এবং সেখানেও প্রচণ্ড বিতর্ক ও কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল বলে প্রকাশ। সংবাদটি একটি বিড়ালিনী ও তার মেয়েকে নিয়ে। সাংবাদিকরা ক্যাপসান লিখেছেন এইভাবে: Dog, Cat, Cog। 'Cat' এর 'C' এবং 'Dog' এর 'og' নিয়ে Cog শব্দটি তৈরি। অবশ্য Cog শব্দের অর্থ প্রবঞ্চিত। বাংলাভাষায় এ ক্যাপসান যদি অনুবাদ করা হত, তাহলে দাঁড়াত-এই: কুকুর, বিড়াল, বিকুর।

ঘটনা এই—বিড়ালিনী 'টিনো' তার মেয়ে 'মিনি'। স্বভাবে মেয়ে মিনি

মায়ের গুণ পেলেও লক্ষণে মার্জারসুলভ নয়, সারমেয় জাতীয়। এখন প্রশ্ন উঠেছে—আসলে মিনির জনক কে? এর পিতৃত্ব কার? খবরে প্রকাশ, মা 'টিনো' নাকি 'পিটার' নামক এক কুকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করেছে এবং ধারণা, তাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের। মিনির অঙ্গাবরণ, কেশ-লক্ষণ ও মুখাবয়বের ঐক্যের ফলে বিড়াল-পালিকার প্রতিবেশীদের স্থির বিশ্বাস, 'পিটার'ই 'মিনি'র জনক। বিশেষজ্ঞরা অনেক চেষ্টায়ও এই জন্ম-রহস্যের কোন কুল-কিনারা করতে না পেরে নাজেহাল হয়ে বলেছেন—মিনির মা টিনোকে জিজ্ঞাসা করা হোক। টিনোকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় শ্রীমতী টিনো 'ম্যাও' শব্দে প্রশ্নকারীদের প্রত্যাশিত উত্তর এড়িয়ে গেছে। যথার্থ জবাব দেবার দায় মেনে নেয়নি। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'একালে নারীরা আর অবলা নয়, তারাই প্রবলা'। শ্রীমতী টিনোর উত্তর এড়িয়ে যাওয়া কি এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে না?

অবৈধ দৈহিক যোগাযোগের প্রশ্নতুলে নারী জাতিকে ধিক্কৃত করতে হলে যতবড় puritan হতে হয় আমি অতবড় শুচিবাতিকগ্রস্ত নই। প্রসঙ্গক্রমে দুই দুজন ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করছি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একজায়গায় বলেছেন: অগ্নি যেমন দহনকার্যে দুষ্ট হয় না, মল মূত্র স্পর্শে যেমন জল দুষ্ট হয় না, তেমনই জার অর্থাৎ কিনা প্রেমিকের সংস্পর্শেও এলেও স্ত্রীগণের কোনও দোষ হয় না। বস্তুত স্ত্রীগণ স্বভাব পবিত্র, কোনও কিছুতেই তাহারা দূষিত হইতে পারে না—(মহাভারত)। আর মহর্ষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বলছেন: বৎস ক্রোধ করিও না। ইহাই নিত্য-ধর্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ শতসহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্মে লিপ্ত হয় না।—(মহাভারত: আদিপর্ব: ১ ॥ ১২২ ॥ ১৪)। মহাজন বাক্য লঙ্ঘন করি সে স্পর্ধা আমার নেই। আমার বক্তব্য অন্য, দৃষ্টি অন্যত্র।

অন্ধকার আলোর অনুপস্থিতি নয়, আলোহীনতাই অন্ধকার। এবং যা অন্ধকার তাকে আলোকিত করা অসম্ভব। কারণ অন্ধকার আলোকিত হয় না। অথচ এই অসম্ভব সম্ভবের ইচ্ছাতেই একালের আমরা ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন। আমাদের অসংযমী কৌতূহল সাধ্যের সীমা ডিঙচ্ছে নিত্য নিয়মিত। তার ফলে জানার পরিধি বাড়ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে জানা কেমনতর জানা? এই কী সেই জ্ঞান, যাতে অজ্ঞানতা বিলুপ্ত হয়? অথবা বোধের দিগন্তকে প্রসারিত

করে? যদি যথার্থ জ্ঞানীই হব, তাহলে আমাদের এত কুৎসিত কৌতূহল কেন? আমরা কি ভেবে দেখেছি, অবৈধ এই অনুসন্ধিৎসার হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে আমরা কোথায় ভেসে চলেছি?

কিছুদিন আগেও মানুষ, সর্বোপরি মানুষ এইটুকু জেনেই খুসি ছিল। একালে তাকে চিরে চিরে ঘেঁটে ঘুটে আমরা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছি—মানুষ, মানুষ ছাড়া আরও কিছু। সন্দেহ নেই আমরা মানুষের আরও বহুতর দিকের, তার ইচ্ছার প্রবৃত্তির কর্মপ্রেরণার এমনি শত সহস্র সূত্র আবিষ্কার করেছি, যা বিস্ময়কর। দ্বিধা নেই বলতে, আমাদের আবিষ্কারের সবটুকুই পণ্ডশ্রম মাত্র নয়। প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কাদের কাছে? যে মানুষ জীবন জটিলতার গভীরতম তত্ত্বের খোঁজ রাখে না, যে জানে না আমাদের মনোলোকের বহুতর দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত, সে যদি শুধু জেনে রাখে মানুষের সমস্ত ইচ্ছার পেছনে কাম, এবং কামনাই আমাদের ইতি-উতি ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে;—তাকে ঠেকান যাবে কোন মন্ত্রে? তাই আজ পর্যন্ত বুদ্ধির প্রভূত চর্চার ফলে, আবিষ্কারের অদম্য নেশায় আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যে রত্নরাজি সঞ্চিত হয়েছে, হিসেব নিকেশে বসলে দেখা যাবে, আমাদের সঞ্চিত রত্নের বেশি অংশই যথার্থ বিচারে মেকি। সোনা বলে যেগুলোকে সিন্দুকে পুরেছি তার বিরাট অংশই রোল্ড-গোল্ড। রঙে সোনা, গুণে নয়।

রঙের মোহ প্রাজ্ঞজনের থাকে না, সে মোহ নাবালকের। শৈশবে রঙচঙে ছবির বই না হলে যে বাড়ী মাথায় তুলত, বয়সকালে সে ছবির বইকে সন্তর্পণে সরিয়ে রাখে। তা বলে রঙকাণা হওয়া প্রাজ্ঞের লক্ষণ নয়। তখন সে একটি মাত্র রঙে ডুবে থাকে—সে রঙ কালো, এবং এই কালো রঙ রঙের অনুপস্থিতি নয়, সকল রঙের সমষ্টি, রঙের সেরা। কিন্তু আশ্চর্য এই, একালের আমরা সে সত্যকে বারবার অস্বীকার করছি যথার্থ জ্ঞানের প্রেক্ষিতে নয়, অজ্ঞানতার মোহে। সভ্যতার চূড়ো ছুঁয়েছি বলে যতই ঢাক পেটাই, আমরা যে শৈশবের সীমা ডিঙতে পারিনি এতেই তার প্রমাণ।

পুরাকালে আমাদের দেশে নাম ধাম কুল শীল জিজ্ঞেস করা হত। জন্মদাতার প্রশ্ন তুলতেন না। কারণ তাতে প্রথমতঃ শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘিত হত, তাছাড়া সে পরিচয় সব সময় ছেলের জানার কথাও নয়, যেহেতু নারী-দেহ সম্বন্ধে একালের শুচিবাতিকতা সেকালে ছিল না। এক মহাভারতেই তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। কর্ণের জীবনে যে প্রশ্ন উঠেছিল সে প্রশ্ন পিতৃত্বের নয়,

পেশার। কারণ সেকালে পেশা নির্দিষ্ট ছিল। একালের আমরা রুচির বড়াই করি, অথচ আমাদের কৌতূহল অন্দর মহলের খবরাখবরে। কারও কেচ্ছা রটাবার সুযোগ পেলে পঞ্চানন সাজি, কদাচিত দশাননও। এ যেন পাঁচ মুখে বলেও ফুরবার নয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, সেকালে কুল শীল বলতে কি বোঝাত। কুল হল, লক্ষণ আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপ দান—এই নয়টি। আর শীল হল, চরিত্র স্বভাব প্রবৃত্তি ও রীতিনীতি। অনেকেই এ সব তত্ত্বের খবর রাখিনে, যেহেতু আমাদের কৌতূহল জ্ঞানে নয়, অ-জ্ঞানে। পুরাকাল আর এ-কালের মাঝামাঝি আরেক কালের অস্তিত্ব ছিল, যখন জ্ঞানের স্পৃহা মানুষের নষ্ট হয়েছে। উৎসের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ছিল সময়ের অপব্যবহার। অবশ্য এসব সাধারণের মধ্যে। তখনও তথাকথিত সাধারণ মানুষ চিরদিনকার মত হুকোমখো সমাজপতিদের মুখাপেক্ষী ছিল। তারা যা বোঝাত এরা তাই বুঝত। এই সব সমাজপতিরাও উৎসের খোঁজ না নিয়ে সমস্ত কিছুকেই শব্দার্থে গ্রহণ করত, ব্যঙ্গার্থে নয়। অথচ ব্যঞ্জনাহীন শব্দ যে প্রাণহীন, একথা বোঝার দায় তারা মাথা পেতে নেয় নি। তার ফলে তথাকথিত দেব-দ্বিজে ভক্তি বেড়েছে, পরম ও চরমের স্থান দখল করেছে কোটি কোটি পুতুল ও প্রতিমা। কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গেছে। টিকি, মালা আর কৌপান-ওয়ালারা মাথার 'পরে নীতির বুলি আওড়েছে দিন রাত্তির। তাতে মন্দিরে মন্দিরে বুদ্ধ-দন্তই রক্ষিত হয়েছে নিরতিশয় শ্রদ্ধায়। বহুতর নীতির দন্তরুচি কৌমুদীর সৃষ্টি হয়েছে, অথচ বুদ্ধের বাণী তলিয়ে গেছে কালের গহ্বরে।

ভোগের আগেই ডাক পড়েছে ত্যাগের। তাতে ফল হয়েছে এই—ঘাটেও ঠাঁই পায়নি, ঘরেও নয়। আর অবশেষে ঘর ও বাহির যুগল নৃত্যে মেতে উঠেছে। এখন হাজার সামাল বলেও সামলান যাচ্ছে না। পাপ নামক জুজুর ভয়ে এখন কেউ আর কাবু নয়, ধর্মাধর্মের লগুড়াঘাতে এখন আর মন টলে না।

একালের মানুষের যুক্তি হল এই—দৈনন্দিন জীবনে আমরা এত পাপ দেখেছি, এত কুৎসিতের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি যে, তাতে আমাদের মাথা বিগড়ে গেছে। তাই সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধবোধ। একালের কলুষের শতাংশের একাংশ দেখে রাজপুত্র কৌপীন পরেছিলেন নির্বাণাকাঙ্ক্ষায়, আর আমরা হা-ঘরের ছেলেরা এখনও টিকে আছি অন্তহীন যন্ত্রণার এই

অগ্নিকুণ্ডে। রাজপুত্রের নির্জন ধ্যান এর তুলনায় অত্যন্ত বালখিল্য নয় কি? তিনি বোধিবৃক্ষের ছায়ায় বসে প্রার্থনা করেছিলেন বুদ্ধত্ব, আর আমরা মাথার উপরে দাউ দাউ শিখা সূর্যকে রেখে, মৃত্যুকে আসন করে দুঃসহ চেষ্টা করছি বাঁচার। অমৃতত্ব নয়, নির্বাণ নয়, শুধুই জীবন। জীবনের প্রতি এই মমতা কি নির্বাণের তুলনায় বহুলাংশে প্রশংসনীয় নয়?

প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহে। প্রাত্যহিক জীবনের অপরিমিত যন্ত্রণাকে বরণ করেও মানুষ বেঁচে আছে, এতে প্রমাণিত হয় প্রাণের পরিমিতিহীন ঐশ্বর্যের। এতে স্বীকৃতি আছে জীবনের, যে জীবন অনন্ত গতিপ্রবাহ, যে জীবন অনির্বাণ।

এর পরেও কিছু প্রশ্ন থাকে। সে প্রশ্নের জবাব অন্যকে দেবার দায় আমাদের নেই, কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে নিজেকে নিজের মুখোমুখী দাঁড় করানর মহত্তম প্রয়োজন আমাদের আছে। এ নিয়ম নয়, নীতি নয়, ধর্ম নয়; এ হল মনুষ্যত্বের দাবী মানুষের কাছে।

আমরা পশু নই, পাশবিকতাকে আমরা ঘৃণা করি। আমরা দেবতা নই, হতে চাইনে, কারণ আমরা পরের দেওয়া ভক্তি ও নৈবেদ্যে বাঁচতে চাইনে। আমরা সংগ্রামী। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত থেকে বাঁচতে চাই, যেহেতু স্বর্গের নন্দনকানন নয় চাইতে ধূলিমলিন এ পৃথিবী আমাদের নিকট আত্মীয়। সুখে-দুঃখে, আনন্দে বেদনায় আমরা [illegible] বাঁচতে চাই। আমার কথা হল যথার্থ বাঁচাই যেখানে মূল্য, [illegible] সে আমাদের কৌতুহলের ও [illegible] কামনার সম [illegible] [illegible]? [illegible] তাদের একথা [illegible] [illegible]।

অবশ্য [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] এবং [illegible] বলছি, আমাদের [illegible] সম্পূর্ণ দায়ী আমরা নই দায়ী তারাই—যাদের হাতে নীতির মুগুর, ধর্মের লাঠি, প্রচারের যন্ত্র, টাকার থলি। যাঁরা সমাজের মাথা ওয়ালা। [illegible] কথা এই তাঁদের এমনতর ঘৃণ্য মনোবৃত্তিকে আমরা প্রশ্রয় দিই কেন? কেন মিলিত প্রতিবাদ করিনে?

এ-কথা দিনের আলোর মতই সত্য, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আমরা প্রার্থনা করতে পারিনে, যেহেতু আমার দৈন্যের পাশেই অন্যের প্রাচুর্যের চূড়ো। আমার ইচ্ছাবৃত্তিকে আমি সংযত করতে চাইনে, যেহেতু আমারই মত আর

একজন ইচ্ছাপূরণে উদ্দাম। যে সমাজের একাংশে প্রাচুর্য, অন্য অংশে দৈন্য, সে সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য। এবং এই অসাম্যের ফলেই নীতির শুভ্র স্তম্ভ ভেঙে পড়ছে, পুরোন মূল্যবোধের চূড়ো লুটচ্ছে ধূলায়। ধর্মাধর্মের বোধ মৃত। কারণ আমি ধর্ম মেনেও যদি দৈন্যকে ডিঙতে না পারি, প্রতিবেশী অধর্মে মগ্ন থেকেও যদি ভোগসুখের চরম আনন্দ উপভোগ করে, তাহলে সেই [illegible]ীন ধার্মিক ব্রাহ্মণ (যে স্বর্গে গিয়েছিল) ও ধনীর গল্পেও আজ ধর্ম-বোধকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। যেন-তেন-প্রকারেণ আমাদের চেষ্টা থাকবে ওপরে ওঠার। তার ফলে সমাজ-সংসার-ধর্ম-শাসন যদি তলিয়ে যায়, যাক্। মূল্যবোধ নষ্ট হয়, হোক। একথা আজ সবাই জেনেছে, হাহাকারকে পেরিয়ে যেতে হলে বিশুদ্ধ চেতনাকে ছুঁয়ে থাকলে চলবে না। তাছাড়া আবিলতাকে সদর দিয়ে অন্দরে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে সাধারণ মানুষ নয়, দিয়েছে তাঁরাই —যাঁরা নীতি-ধর্মের ধ্বজার আড়ালে বসে বড় বড় বুলি আউড়েছেন। যাঁরা সমাজের উপরে বসে চোখ রাঙিয়েছেন এবং আজও রাঙাচ্ছেন।

অবৈধ কৌতূহলের ফানুষ উড়িয়ে যাঁরা সাধারণের মনকে ঠেলে দিয়েছেন কেচ্ছার পঙ্কে, তাঁরাই আজ 'সমাজ সংসার গেল' বলে চিৎকারে আকাশ ফাটাচ্ছেন। কিন্তু সত্য নির্মম। এতে কোন ফল হবে না। অবৈধ কৌতূহল সৃষ্টির স্রষ্টা যাঁরা তাঁদেরই সচেতন হতে হবে প্রথমে, নইলে সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়বে এই আগুন। তার পরে যা ঘটবে তা কথার কড়ি নয়, বাণীর হাউইও নয়, তা [illegible]। ভাগ্যিস্ আজকের সমাজের দিকে যথেষ্ট গভীর ভাবে তাকালে প্রাক্-বিপ্লব অরাজকতার [illegible]ই কি চোখে পড়ে না?

দোহাই আপনাদের, নক্ষত্র চিন্তা ছেড়ে একবার নিচের দিকে লক্ষ্য করুন, [illegible] দলবদ্ধ হচ্ছে তলে তলে। ওদের মিলিত চেষ্টা শত লক্ষ খাণ্ডব-দহনকেও হার মানাবে। এমন কি সূর্যের প্রচণ্ড বিস্ফোরণও তার কাছে মনে হবে হাউইয়ের উল্লাস।

আমি কি মিথ্যে বলছি?

১৩৫৮

সাহিত্যের যথার্থ পাঠক

যা সত্যিই কঠিন তা সহজ করে বলা যায় না, বলতে গেলে বক্তব্য গুরুত্ব হারায় এবং বিষয় মর্যাদা। এই সহজ কথা যারা বোঝে না, কিছু সংখ্যক সৎসাহিত্যিক আছেন তাঁরা এদের সঙ্গে স্বর্গে যাত্রা করার চাইতে একা একা নরকের দ্বারে পৌছন সৎশিল্পীর কর্তব্য হিসেবে যথার্থ মনে করেন।

আপাত দৃষ্টিতে যে মহৎ সৃষ্টিকে তথাকথিত সহজ বলে মনে হয়, বস্তুতঃ সেই সত্যিকার সহজ রচনা খুব সহজ অনুভবগম্য নয়; বরং তা বহুল পরিমাণে কঠিন এবং তাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে বহুদিনের সহৃদয় অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ সহজ রচনা শুধু শব্দে নিজেকে প্রকাশ করে না, তার প্রকাশ 'টোনে'। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি লাইন উদ্ধৃত করছি—

'সে কাল আসবে বলে চলে গেছে,
আমি সেই কালের পানে তাকিয়ে আছি।'

অথবা

'বেলা গেল, পারে যাবি না?'

উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতি যে গভীর অর্থে সমৃদ্ধ, সে অর্থ একমাত্র রসিক পাঠক ছাড়া অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে বাধ্য।

তথাকথিত 'পাখী সব করে রব' ধরণের সহজের কারবার যাঁরা করেন তাঁরা করেন, এবং এ ধরণের সহজে যে সব পাঠক তৃপ্তি পায় তাদের কাছে নিবেদন—সাহিত্য মশলার ফর্দ বা মালিকের কাছে লেখা ছুটির দরখাস্ত মাত্র নয়।

বর্ণবোধের পাঠ অক্ষরজ্ঞানের জন্যে যেমন অপরিহার্য, বর্ণজ্ঞানের জন্যেও রঙের পাঠ অত্যাবশ্যক। অন্যথা বর্ণবোধের অক্ষরের সাহায্যে বর্ণজ্ঞান অসম্ভব। সাহিত্য—বর্ণ বা অক্ষরের খেলা নয়; সাহিত্য—বর্ণ তথা রঙের খেলা। সে রঙ লাল নীল হলদে নয়; সে রঙ মানুষের সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের স্বপ্ন—একথা এদেশের তথাকথিত বর্ণবোধ

শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকদের বোঝান খুব সহজ নয়। মজা এই, এ ধরণের পাঠক সম্প্রদায় নিজেদের রসজ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়িতেও কম যায় না। এ নিতান্তই এ দেশের দুর্ভাগ্য। তা বলে কিছু সংখ্যক অকালপক্ক বা তথাকথিত অতিপ্রাজ্ঞ লেখকের মাথামুণ্ডুহীন খিচুড়ী রচনার বাহবাও আমি কিছুতেই দিই না; যেহেতু তাঁদের অনেকেই কি বলতে বা কি বোঝাতে চান সে কথা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। অবশ্য মগজের অভাব বলব না—কারণ বহু বহু প্রখ্যাতনামার রচনার উদ্ধৃতি তাঁদের রচনায় এমনভাবে ছড়ান ছিটন থাকে যে যাঁদের কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এ সব কাবুলি পণ্ডিতদের রচনার ধরণ দেখে মনে হয়, এরা যেন ভাব ও ভাবনার সাথে কুস্তি লড়তে নেমেছেন কৌপীন এঁটে; শেষ পর্যন্ত এ ধারণা করতে বাধ্য করেন যে, হয় এঁরা যত জোরে বলতে চান ক্ষমতার অভাবে তেমন করে বলতে পারেন না, অথবা সাহিত্যিক-দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন না হওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় সংযম ও পারিপার্শ্বিক চেতনা এঁদের নেই। এবং তাই, তাঁরা খেই হারিয়ে কথার প্যাঁচ কষে চলেন। এঁদের সাহিত্যিক বলা চলে কিনা আমি জানিনে। এ প্রবন্ধে এঁরা প্রাসঙ্গিক বলেই এঁদের উল্লেখ করলাম। আসলে আমার লক্ষ্য তথাকথিত পাঠক—যারা বিনা কষ্টে কৃষ্ণ লাভ করতে চান এবং শ্রীরাধার সঙ্গ। কিন্তু রাধার নাচ আর কৃষ্ণের বাঁশীর যুগল-রস পেতে হলে লক্ষ মণ তেল পোড়াতে হয়, অন্যথা লক্ষ্যবিদ্ধ হয় না, হবার নয়; এরা সে কথা বোঝে না, বুঝতে চায় না।

রাবণের ইচ্ছা ছিল স্বর্গে-মর্তে্য একটি সিঁড়ি তৈরী করার, যাতে পা রেখে অপামর জনসাধারণ স্বল্পায়াসে স্বর্গে পেঁৗছতে পারে। করি করি করে সে কাজ আর হয়ে ওঠেনি। সেই আক্ষেপ বুকে করেই রাবণ মরেছেন। তারপরে আর কারোরই এমনতর মহৎ সংকল্প ছিল না। মহাভারতের ধর্মপুত্রের সমস্ত মহৎগুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত স্বার্থপরের মত একাই স্বর্গে গেলেন।

সত্যি বলতে কি সব সদিচ্ছাই সত্য হয় না, এবং বাহবাও পায় না। রাবণের আকাঙ্ক্ষা হয়ত সত্য, কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না। অসম্ভব সম্ভবের কল্পনা উন্মাদের। রাবণ স্ব-ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে তাই-ই হয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির স্থিতপ্রাজ্ঞ। তিনি জানতেন স্বর্গের পথ দুর্গম, দুশ্চর-সাধনলভ্য। স্বর্গ-মর্তে্য সিঁড়ি পরিকল্পনা সম্ভব হলেও, যোজনা অসম্ভব। তাই প্রাত্যহিক সৎ-অনুশীলনের সিদ্ধি স্বরূপ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়েছিলেন। হতে পারে এ কাহিনী

কাল্পনিক, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এ কাহিনী রূপক। সে জন্যে কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও অসত্য নয়, সম্ভাব্য সত্য।

সাহিত্যের, বরং বলি রসের স্বর্গে পৌছনর পদ্ধতিও অনুরূপ। কারণ রস বিশ্লেষণ-সাধ্য নয়, অনুভবগম্য। সেখানে সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে পৌছন যায় না। রসের স্বর্গে পৌছনর জন্যে অনুভব-ক্ষমতাকে বাড়াতে হয়।

অনুভব-ক্ষমতাকে বাড়ানর জন্যে প্রয়োজন প্রাত্যহিক অনুশীলন। অনুশীলন—বিদ্যার বুদ্ধির ভাষায় বহুতর পঠন-পাঠনের ফলে মনের গ্রহণ-ক্ষমতা বাড়ে। একনিষ্ঠ চর্চায় রসের মন্ত্রগুপ্তি এবং ভাবের গূঢ়তর ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে। সর্বোপরি ভাল-মন্দ, সৎ-অসতের বোধ স্পষ্ট হয়। অন্যথা গীতের মর্ম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, মনে হয় একঝাঁক বিচ্ছিন্ন বেসুরো ধ্বনি মাত্র। এবং গীতার ধর্মতত্ত্বও বোঝা যায় না। তখন গীতার নির্দেশ পালনের চাইতে উচ্চারণ শুদ্ধিই বড় হয়ে ওঠে। এর ফলে পরকালের কাজ হয় কিনা জানিনে, কিন্তু ইহকালে ভীষণ নিষ্কর্মা হয়ে ওঠে ;—শত সহস্রবার কর্মযোগ পাঠ করা সত্ত্বেও এ প্রত্যক্ষ সত্য।

তাই ভয় হয়, অনুশীলনের কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা। প্রথমত একদল অনুশীলনের নামে বহুতর ব্যস্ততার দোহাই পাড়বেন। অন্যদল এমনই অনুশীলন করতে পারেন যে, যার ফলে 'গীতাপাঠের উচ্চারণ শুদ্ধি'ই হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়তঃ হালের বিচিত্রবর্ণ মলাটের প্রদর্শনী দেখে মাথা ঘুরে গেলে যথেচ্ছ বিহারও অসম্ভব নয়। তার ফলে 'মোহন' থেকে 'কিরীটী রায়', 'মানদার আত্মচরিত' থেকে 'বটতলার প্রেমকাহিনী' কিছুই হয়ত বাদ যাবে না। অতএব অগ্রিম জানিয়ে দিচ্ছি পঠন মানেই যথেচ্ছ পড়া মাত্র নয়, অনুধাবন করা। এবং নির্বিচারে সব বই নয়, বাছাই করে।

বরং সরাসরি বলি, মনীষী-সাহিত্যিকদের মহৎ রচনার অনুশীলন, যা কালের সীমা ডিঙিয়েও মহৎ।

মহৎ লেখকেরা লেখা লেখা খেলা করেন না। অর্থহীন কথা বা ব্যঞ্জনাহীন শব্দের সাহায্যে পরিবেশ সৃষ্টি করার দুর্বলতা তাঁদের নেই। সে দুর্বলতা স্বল্প-ক্ষমতার অধিকারী লেখকদের, যাঁরা সত্য উদ্‌ঘাটনের চাইতে চমকে দিতে ভালবাসেন, জীবন-ধর্মকে স্পষ্ট করার চাইতে নায়ক-নায়িকার জীবনে অবৈধ রসের আমদানী করে পাঠক ঠকাতে। মহৎ রচনাকার প্রতিটি শব্দের পেছনে

কলকাতার

চিন্তা এবং সময় ব্যয় করেন। সব চাইতে বড় কথা সস্তা হাততালির লোভে তাঁরা সাহিত্য করেন না, তাঁরা জীবনের দুঃসহতম তাগিদে কলম হাতে নেন। মনোরঞ্জনের দায় তাঁরা মাথা পেতে নেন না বলেই তাঁদের লক্ষ্য জীবনের গূঢ়তম সত্যকে উদ্‌ঘাটন, যন্ত্রণার উৎস আবিষ্কার ও মহৎ উত্তরণে সাহায্য করা। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য, কি গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস বা অন্যবিধ রচনা প্রথম পাঠে হৃদয়ঙ্গম না হওয়াই স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ রস-গ্রহণের জন্যে বহুবার পঠন-পাঠন অনিবার্য। এবং বলে রাখা ভাল, সে-সাহিত্য অনেক বড়। সে-সাহিত্য দুশ্চর সাধনার ফলশ্রুতি। বছরে সে ধরণের রচনা হাজারে হাজারে রচিত হয় না। বিদ্যাপতির ভাষায় বলা যায়, 'লাখে না মিলিল এক'। কয়েক লক্ষ বইয়ের মধ্যে মাত্র গুটি কয়েকখানা। এবং একথা মর্মান্তিকভাবেই সত্য, যাঁরা বই লেখেন তাঁরা সবাই লেখক বটে, তবে সমরসেট মম বলেন— 'হাজার জন লিখিয়ের মধ্যে যথার্থ সাহিত্যিক মাত্র একজন'। আর ন'শ নিরানব্বই জন সাধারণ লেখক মাত্র। সৎ পাঠকের দায়িত্ব সহৃদয় অনুশীলন করে সেই অন্যতম একজনকে খুঁজে বের করা। এ দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন।

বটতলা মার্কা যে সমস্ত লেখা হালের সাহিত্যে পুচ্ছ নাচিয়ে সংস্করণের পর সংস্করণ হচ্ছে প্রতিমাসে, এ সমস্ত রচনা সাহিত্য নামের আড়ালে এক ধরণের বিকৃত মানসিকতার অধিকারী লেখকদের প্রলাপ; এ সাহিত্য নয়। যে সাহিত্য শুধু মাত্র পাঠের আনন্দ দেয়, অথচ উত্তরণে সাহায্য করে না, বরং বিকৃত বিকারকে বরণ করতে প্রলুব্ধ করে—সে রচনা সাহিত্যের আসরে জঞ্জাল। মহৎ-সাহিত্য মহৎ উদ্বোধনে সহায়তা করে, মহৎ লক্ষ্যের পটভূমিকে করে বিস্তৃত। এবং মানুষের দুঃসহতম অধঃপতনকে অঙ্গুলি নির্দেশে সচেতন হতে বাধ্য করে। আসলে যে সাহিত্য সৎ-সাহিত্য, সে সাহিত্যের মহৎ বক্তব্য থাকবেই। এবং সে রচনার প্রাথমিক গুণ যথার্থ অর্থে শিল্প হওয়ায়, দ্বিতীয়তঃ পাঠকের বুদ্ধি ও বোধকে উন্নত হতে সাহায্য করায়।

প্রাসঙ্গিক বলেই আরও জানিয়ে রাখি, শুধুমাত্র ক্ষয়ের চিত্র—যা শিল্পের সমস্ত প্রকরণগত দাবী মিটিয়ে জীবন্ত, (সত্য বলেই)—এবং সে সাহিত্যের স্রষ্টা তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে মানব মনের গূঢ়তম স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের যত বড় কৃতিত্বই দেখাক না কেন—যদি লক্ষ্যভূমি সঙ্কীর্ণ হয়, যদি মানুষকে রুদ্ধশ্বাস নিরাশার জগদ্দল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়—শৈল্পিক কৃতিত্ব সত্ত্বেও সে সাহিত্যের মহত্ত্ব খণ্ডিত। কারণ, সাহিত্য সর্ব সময়ে জীবনের অনুসরণ করে

না—করলে সাহিত্যের কোন মূল্যই থাকত না। আসলে জীবন, চরমতম হতাশার মুহূর্তে সাহিত্যের অনুসরণ করে। তথা সাহিত্য, জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস গতি নিয়ন্ত্রণে করে বেগকে ছন্দের শৃঙ্খল পরিয়ে সংযত হতে সাহায্য করে বলেই সাহিত্যের মর্যাদা। অন্যথা ভোলা রাম গুড়ের নথি-পত্রের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনই তফাৎ থাকত না।

অবশেষে আমার কথা ফুরল। কিন্তু ইতির পরে থাকে পুনশ্চ। অতএব পুনরায় আমি বলছি—সৎপাঠক নির্বিচারে পড়ে না, বাছাই করে। সৎপাঠক হবার প্রাথমিক গুণ, যথার্থ বাছাই। বাছাইয়ের কাজে যে অপটু, রসের হাটে সে ঝাড়ুদার।

প্রশ্ন উঠতে পারে—বাছাইয়ের মানদণ্ড কি? সমালোচকের সমালোচনা?

না, তা নয়। আমার মতামতও অগ্রাহ্য করতে পারেন। এর কোনটাই নির্ভর যোগ্য নয়।

তাহলে—?

বাছাইয়ের মানদণ্ড পাঠকের সৎবুদ্ধি,—না বুদ্ধি নয়—পাঠকের বিবেক।

১৯৫৮

দুয়ার অদূরের ঈষৎ বাঁকাদেহ পেশল অশ্বত্থের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। তার শাখায় পাতায় জড়াজড়ি করা চন্দ্রাতপের নিচে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা আমার পুরোন অভ্যেস। ভাল লাগে তার নাতি-দীর্ঘ দেহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশেব নিঃসীম শূন্যতাকে স্পর্শ করতে। ভাল লাগে মধ্যরাত্রির নিবিড় নির্জনে স্বতঃবেগে উৎসারিত তার পত্রপল্লবের করতালিতে হঠাৎ কথা কয়ে ওঠা তাকে। তার দুর্দম প্রাণাবেগ আমাকে অনেক নিশুতি রাতে বিস্ময়ের বিপুল রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছে আমার অজান্তে।

এই বনস্পতির উত্তরমুখো ডালটা গতকাল কেটে দিয়েছে পোড়ো জমির মালিক। কারণ সেখানে প্রাসাদ উঠবে, বিরাট প্রাসাদ। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা সে জমিতে আর কোনদিন কানামাছি খেলতে পাবে না, এবং রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ফড়িঙগুলো ভাঙা বিকেলেব রোদে ডানা ছড়িয়ে ভাসবে না হাওয়ায়, আমি জানি। এও জানি, উত্তরমুখো অশ্বত্থের কোন ডাল আর কাউকেও একটি মুহূর্তের জন্যেও ছায়ায় শান্তি দেবে না, তাপিত-দেহে স্বস্তি।

এ গাছের আরও ডাল কাটা পড়েছে আগে। যেবারে প্রথম ডবল-ডেকার চালু হল, দক্ষিণের ডালটা কাটা পড়ল সেবারে। পুবের ডাল ভেঙে পড়েছে ঝড়ে। আর পশ্চিমে, গাছটা বাড়েইনি। শাখাগুলো নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে, হয়ত ভয়ে। কল্পনা কবার প্রয়োজন নেই, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আর কিছুদিন পরে এ রাস্তা প্রস্থে আরও বাড়বে। দুদিকে তৈরী হবে ফুটপাথ, মানুষ চলাচলের জন্যে। সেদিন কাঠুরের ছাযা পড়বে অশ্বত্থের গোড়ায়। এবং এ গাছের শেষ চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চিরদিনের মত। সেদিন কেউ কি আর্তনাদে ফেটে পড়ে বলবে,—

এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ,
হাঁক দিয়ে নয়, কাৎরানীতেই!

পাষাণপুরী কলকাতায় মানুষ বাড়ছে।

কালের কুশলী কারিগর জবচার্ণকের কলকাতাকে চিহ্নহীন করেছে দীর্ঘদিন। একালের মহানগরীতে সে-কলকাতা পুরোন উপকথার বুড়ো

ঠাকুর্দার পোড়ো কুঁড়েঘর। সে হারিয়ে গেছে। সুতোনটির বটের ছায়ায় বসে হুঁকোখোর চার্ণকের কুঁড়েঘরের কুপির আলো আজ দাউ দাউ শিখা। কলকাতা যেন খাণ্ডব। কাজে অকাজে কোলাহলে দিনরাত্রি বিরামহীন জ্বলছে। তবু দম বন্ধ হচ্ছে না কলকাতার। বরং সে নিজের পরিধি বাড়াচ্ছে দ্রুততর। বৃহত্তর কলকাতা আর স্বপ্ন নয়, সম্ভাব্য সত্য।

এককালের ভারতের রাজধানী, যুক্তবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র এবং একালের পশ্চিম-বঙ্গের হৃৎপিণ্ড এ কলকাতা। এ শহরে চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। আরও বিশ লক্ষাধিক লোক সকালে আসে, রাত্রে ফেরে। মানুষের অস্বাভাবিক চাপে কলকাতা অহরহ গজরাচ্ছে। এ গজরান অন্তহীন।

শাসন ক্ষেত্রে সর্বময় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা যখন একটি পার্টির বিশেষ একটি মানুষের হাতে আসে, তখন তাকে বলি ডিক্টেটর। তখন পার্টি ডিক্টেটরকে চালিত করে না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডিক্টেটরই চালিত করে পার্টিকে। যেমন রাশিয়ার ষ্টালিন, জার্মানীর হিটলার, ইতালীর মুসোলিনী। শাসন ক্ষেত্রে যেমন, দেশের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। কোন দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য যদি একটি কেন্দ্রে জড়ো করা হয়, তখন রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের ইতিহাস গড়ে ওঠে সেই বিশেষ কেন্দ্রকে ঘিরে। তখন দূর দূরান্তের অখ্যাত অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষটিও কান পেতে থাকে সেই কেন্দ্রের দিকে। কারণ, কেন্দ্রভূমিতে গুঞ্জন উঠলেই সোরগোল, অন্যথা ন যযৌ, ন তস্থৌ। বাংলা দেশে কলকাতা আজ তেমনতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

এদেশের ভৌগোলিক বিস্তৃতি অল্প হলেও নিতান্ত অল্প নয়। উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণের সুন্দরবন পর্যন্ত তার বিসারিত লীলাভূমি। এবং এ কলকাতা এই ভূখণ্ডের পতন অভ্যুদয়ের কর্তা। গোখেলের কথার হের-ফের করে বলা যায়—আজ কলকাতা যা ভাবে আগামীকাল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তাই ভাববে। কারণ অনেক। প্রথমতঃ কলকাতা শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রভূমি মাত্র নয়, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক সর্ব রকম লেন-দেনের একমাত্র মূল কেন্দ্র। শিক্ষার, চাকরীর এবং শিল্প সংস্থার প্রাচুর্য এই কলকাতায়। দ্বিতীয়তঃ এ শতাব্দীর ও গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপরিমিত সুযোগ-সুবিধে গ্রহণের সীমাহীন ব্যবস্থা আছে এ শহরে। তৃতীয়তঃ সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত রকমের উপকরণ জড়ো করা হয়েছে এখানেই। গ্রামের বা

কলকাতার

শহরতলির মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করতে হলেই কলকাতার জলে মাথা ধুতে হবেই। অন্যথা তার চিন্তা-ভাবনা পিছিয়ে থাকবে কয়েক দশক। চতুর্থতঃ, কলকাতা নির্ভরযোগ্য আত্মিক উন্নয়নে নয়, আর্থিক উন্নয়নে। এবং তাই কলকাতা চব্বিশ ঘণ্টায় পুরোনকালের চব্বিশ মাসের সীমা ডিঙচ্ছে; যেহেতু তার চেষ্টা দ্রুত চলায় প্রথম সারির এথিলেট হওয়া। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, মস্কো, প্যারিস ও টোকিওর সমপর্যায়ের। তাই সে ছুটে চলেছে। আর কলকাতার যারা ওয়ারিশদার কলকাঠি নাড়ার এবং পুকুর চুরির—তারা চেষ্টা করছে কলকাতাকে আরও কত মনোহারী করা যায়। এদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুব অল্প। সেদিন সমস্ত দেশ মাথা গুঁজবে এসে এ শহরে। সে সম্ভাবনা এখনই স্পষ্ট। প্রতিদিন মানুষ বাড়ছে কারণ তাদের ধারণা কলকাতায় আছে নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের প্রচুর সুযোগ, এবং দিন যাপনের পরিমিতিহীন সুবিধে ও উপকরণ। তার ফলে সারা দেহের রক্ত জমে উঠছে মুখে ; সারা দেশের প্রাণশক্তি জড়ো হচ্ছে কলকাতায়। অথচ এ যে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ এ কথা খোকারাও বোঝে, কিন্তু বুড়োদের মাথায় কিছুতেই ঢুকতে চাইছে না।

যারা শুধু মাত্র দুমুঠো খেয়ে বাঁচতে চায় আজ তারাও জেনেছে কলকাতাই সব। তারা জেনেছে দুর গাঁ থেকে আর্তনাদ করলে 'ইচ্ছে করে কালা সাজা' শাসকদের কানে তাদের ডাক পৌছয় না। তাই তারাও মিছিল করে ছুটে আসছে, মিটিং করছে শাসকদের দুয়ার অদূরে, কানে না শুনলেও যাতে চোখে দেখে! এমনতর অজস্র দাবি-দাওয়া হৈ চৈ এ কলকাতা উঠছে নামছে। এবং বিশ্বাস করুন মাত্রাধিক ঘামছে। রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন—For God's sake, stop this practice of taking out processions every day in calcutta. দোহাই আপনাদের, নিত্যদিন কলকাতায় মিছিল করে মানুষ তাড়িয়ে আনার অভ্যাসটা ছাড়ুন। কারণ, There were many people who wanted to work in peace. এখানের অনেক মানুষ শান্তিতে কাজ করতে চায়। —এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল, অন্যের মুখে খুদ-কুঁড়ো দেবার ব্যবস্থা না করে নিজেরা ভরপেট খেয়ে নাভিকুণ্ডলীতে তেল দিয়ে নাক ডাকানর চেষ্টা করা কি মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ নেওয়া নয়? একথা আজ স্পষ্ট যে শাসকরা কাজের চাইতে অকাজ করেন বেশি। এবং সত্য এই, আজকের আন্দোলনের সবটাহ বিরোধী দলের কারসাজি নয়।

এহো বাহ্য! যা বলছিলুম : কলকাতা আর পারছে না। আশপাশের গ্রামগুলোকে কুক্ষিগত করেও না। একে বাঁচানর জন্যে পরিকল্পনা হল কল্যাণীর। কল্যাণী বয়সে খুকি। কয়েক বছর বয়স হল তবু গায়ে-গতরে বাড়ছে না। কেন বাড়ছে না সে কথা মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন। আমাদের ধারণা রিকেটি হয়েছে। আশ্চর্য এই আমাদের বিখ্যাত ডাক্তার-মুখ্যমন্ত্রীও তাকে সারিয়ে তুলতে পারছেন না। পারবেনও না। আমরা যতদূর জানি, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানও শূন্যে অবস্থিত নয়। তাকে শূন্যে তুলে ধরার জন্যে নিচে স্তম্ভের ব্যবস্থা আছে। কল্যাণী সম্বন্ধেও তাই। প্রচুর বিজ্ঞাপনে কল্যাণী বাড়বে না, তার জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন।

গান্ধিজীর মতবাদের মূল কথা ছিল বিকেন্দ্রীকরণ; ক্ষমতার, অর্থের। কারণ, তিনি জানতেন জাতির এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে প্রযোজন ক্ষমতার বিভাজন এবং অর্থের যথার্থ বণ্টন। তাতে পরিবেশের সহযোগিতায় সাধারণ মানুষের শক্তির যথার্থ বিকাশ ঘটে। এবং এ কালের মানুষের বিশ্বাসও অদ্বৈতে নয়, বিশ্বাস বহুতে। তার ফল দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ত। সমগ্র দেশ এগিয়ে যেত সমান তালে। কিন্তু এখন সমস্ত ক্ষমতা জড়ো হযেছে জন কযেক লোকের হাতে। আর সারা দেশের শক্তি গা ঘেষাঘেঁষি করছে এক জায়গায়। এ কলকাতায়।

গাছপালার বিকাশের জন্য প্রযোজন প্রয়োজনীয আলো-হাওয়ার। কারণ ভিড়ে তারা বাঁচে না, অথবা যথার্থ বিকাশ ঘটে না। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। শক্তির গা ঘেঁষাঘেঁষিতে শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। বদ্ধ নদীর অবস্থা হয়ে ওঠে জাতির, মানুষের। কলকাতার অপরিসরে আজ যে সংখ্যক মানুষ আছে তাদের কারও পক্ষেই বাঁচার মত বাঁচা সম্ভব হচ্ছে না। অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ স্বল্পতায়, আর্থিক অনটনে, সবাই মরিয়া। এমন অবস্থায় আরও লোক বাড়ছে। অথচ কলকাতার সুযোগ দানের, ধারণ করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সে পারে না গোটা বাংলা দেশকে ঠাঁই দিতে। শুধু কি বাংলা দেশ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের ভিড়ও কম নয়। এ জন্যে প্রযোজন ছিল কল্যাণীর মত নগর পরিকল্পনা। প্রয়োজন আছে আরও অজস্র কল্যাণীর। কিন্তু মস্তকহীন দেহ যেমন নিরর্থক, তেমনি যথার্থ সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থাহীন কল্যাণীর পত্তনও অর্থহীন। এ কথা কে না জানে,

প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে (কি বৈষয়িক, কি অর্থনৈতিক) না থাকলে একটি লোকও কলকাতা ছেড়ে যাবে না।

যদিও জানি কলকাতাকে একদিনে গড়া যায় না। কলকাতার মত কিছুও নয়। যেহেতু কলকাতার অতীত দু'শ ষাট বছরের। এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য আরও কলকাতা না গড়লে এ কলকাতা মরবে; এবং এই বাংলা দেশ। অতএব পন্থা ?

জ্যান্ত ময়ূরের পেখমের নাচ ঘরে বসে দেখার সুযোগ সবার হয় না, কিন্তু অবিকল ময়ূরের ডামি সম্ভব। চল্লিশ লক্ষের কলকাতা অসম্ভব হতে পারে কিন্তু চল্লিশ হাজারের কলকাতা অবাস্তব নয়। তার জন্যে প্রথম প্রয়োজন ক্ষমতার কেন্দ্রকে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ স্কুল কলেজ ও স্বল্প প্রয়োজনীয় অফিসের স্থানান্তর, তৃতীয়তঃ শিল্পসংস্থাগুলোকে কলকাতা থেকে সরান, এবং কলকাতার চমক লাগান উপকরণের মাত্রা হ্রাস।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যায়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মানসকন্যা কল্যাণীকে গড়ে তোলার জন্যে যে পরিমাণ রাষ্ট্রের অর্থ ও শক্তির অপব্যয় করে চলেছেন, সেই টাকায় কলকাতার আশে পাশে উঠতি শহর—যে গুলো প্রয়োজনীয় সাহায্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে অপরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ—সেগুলিকে কল্যাণীর চাইতে শতগুণ সুন্দর করে তোলা যেত বলে আমাদের ধারণা। শুধু তাই নয়, পশ্চিম বঙ্গের একশত চোদ্দটি শহর যদি কিছু কিছু সাহায্য পেত এবং সে সব শহরে সরকারি অফিস ও অন্যান্য স্বল্প প্রয়োজনীয় সংস্থাগুলোকে সাহসের সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হত, তাহলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কলকাতার এই অস্বাভাবিক চাপ বহুল পরিমাণে কমত। এবং নতুন কল্যাণীর প্রয়োজন হত না; এ গুলোই কল্যাণী হয়ে উঠতে পারত। এমন কি কলকাতার এক একটি ছোট্ট সংস্করণ। হয়ত মুখ্যমন্ত্রী কায়কল্প চিকিৎসায় বিশ্বাস করেন না—নইলে এদিকে তাঁর এতদিন নজর পড়েনি কেন ?

এ কথাগুলো হয়ত নিরর্থক। নিরর্থক বলছি, কারণ একালের পৃথিবীর শাসকদের লক্ষ্য উন্নয়ন নয়, শোষণ। ক্ষমতার বিলিকরণ নয়, কেন্দ্রীকরণ। তাতে দাপট দেখানর সুযোগ প্রচুর, আত্মীয় তোষণের সুবিধে বিস্তর। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বেলুন কেউই ফোলাতে পারেনি। না সীজার, না হিটলার, স্টালিন, মুসোলিনি, কেউই নয়। ইতিহাস তার সাক্ষী। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হল, কত শাসক নিশ্চিহ্ন। অথচ মানুষ এমনই মূঢ় যে

ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার অভ্যেস এখনও সে ছাড়তে পারেনি। তবু কথাগুলো বলছি, যেহেতু মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস না রাখলে বাঁচা চলে না। এবং আমি জানি মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া পাপ।

কি দুঃখ! কলকাতাকে যথার্থ বাঁচানর এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। আর, কলকাতা না বাঁচলে বাংলা দেশ মরবে; এবং বাঙালী॥

১৯৫৮

মৃত পিতৃ-পুরুষ ও কলকাতার রাস্তা

কলকাতা কর্পোরেসনের বহুতর অব্যবস্থার প্রতি মুখ্য-নাগরিক মেয়র থেকে মুখ্যমন্ত্রীর, কংগ্রেস সভাপতি থেকে কর্পোরেসনের কাউন্সিলারের, দেশের হোমরা-চোমরা ব্যক্তি থেকে ইতর জনের, কোন না কোন ব্যাপারে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা দৈনিক সংবাদ-পত্রের নিত্য-নৈমিত্তিক খবর। সে সব খবর যথার্থ হোক চাই না হোক, এত সব দোষ-ত্রুটি-বিশৃঙ্খলাকে মেনে নিয়েও একটি ব্যাপারে কর্পোরেসনের প্রচেষ্টাকে আমি প্রশংসা না করে পারিনে, অবশ্য সেখানেও পুরোপুরি মতের ঐক্য সব সময়ে হয়নি, তবুও। কারণ আমার মতে মতামতের উনিশ-বিশ স্বাভাবিক।

যেমন ছকু খানসামার পক্ষে ছকু খানসামা লেনই যথেষ্ট, ভোলা ময়রার জন্যে ভোলা ময়রা লেন। দেশবন্ধু দেশপ্রিয়ের জন্যে এভিন্যু যথার্থ। এমন কি শরৎ চাটুয্যে অথবা রাসবিহারীর জন্যে এভিন্যুতে আমি একটুও বিরক্তি বোধ করিনে। অথবা ধরুন, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্ল রায়ের জন্যে ভাগাভাগিতে সার্কুলার রোডের ব্যবস্থা আমার কিছুতেই খারাপ মনে হয়নি। তাই বা কেন, আশুতোষ মুখার্জি ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অথবা নেতাজি সুভাষ বোসকে যদিও মানি রোডের পরিসরে ধরান কষ্টসাধ্য, কিন্তু মেনে নিতে একটুও বাধেনা, যখনই মনে পড়ে বিবেকানন্দ রোডের কথা। কিন্তু মনে বড় দুঃখ পাই যখন মহাত্মা গান্ধিকে রোডে ধরান হয়, অথবা বঙ্কিম চাটুয্যেকে নগণ্য স্ট্রিটে এবং

হরিনাথ দে-কে নামে রোড, অথচ যথার্থ বিচারে লেনে। এমনি আরও আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে রাজাকাটরার পচা পেঁয়াজ আলুর গন্ধে ভুর-ভুর এলাকায় ঢোকান কি যন্ত্রণাদায়ক নয় ?

এহো বাহ্য। সবচেয়ে প্রশংসার কথা রবীন্দ্রনাথকে এখনও কোথাও ধরানর চেষ্টা কর্পোরেসন করে নি। এ অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত। কারণ রবীন্দ্রনাথের জন্যে রোড অসহ্য। এভিন্যু অচল। তাহলে কোথায় ধরান হবে বিশ্বকবিকে ? কলকাতার লোক যাই বলুক, আমি মনে করি রবীন্দ্র-নাথকে তথা তাঁর নামকে ব্যবহার করার দুর্মতি কর্পোরেসনের না হওয়াই ভাল। তিনি বিশ্বকবি। কলকাতা বা বাংলার নয়, ভারতবর্ষের বহুকালের ইতিহাসে এত বড় মনীষার তুলনা বিরল। অতএব তাঁকে এভিন্যু বা রোডে ধরাবার চেষ্টা যে করেননি তার জন্যে কর্পোরেসনের কর্তা ব্যক্তিরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পেতে পারেন। এবং আমি মনে করি রবীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার ইত্যাদির বাড়াবাড়ি না করাই ভাল ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ যদি কলকাতার নাম পাল্টে রবীন্দ্রনগরও করেন তাতেও রবীন্দ্র-নাথের সঠিক মর্যাদা রক্ষিত হবে না। বরং এ সুযোগে আমার একটি পরি-কল্পনার কথা বলি ; যদিও বিজ্ঞজনদের মনঃপূত হবে কিনা জানিনে। তবে সে পরিকল্পনা সফল হতে পারে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে। নয়ত নয়।

সাধারণতঃ পথ তিনপ্রকার। স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। আরও দু এক রকমের পথ আছে তবে তা বস্তুবাদীদের জন্য নয়, ও হল অধ্যাত্মবাদীদের এলাকা। এ তিন পথের স্থলপথে রবীন্দ্রনাথকে ধরান অসম্ভব, জলপথও ভয়ানক সীমাবদ্ধ এবং প্যাঁচাল। কিন্তু আকাশপথ আকাশের মতোই। যেমন বাধা-বন্ধের বালাই নেই, তেমনি উদারতায় বিশ্বগ্রাসী। অতঃপর আমার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বছরে ভারতবর্ষের আকাশ-পথের নামকরণ করুন 'রবীন্দ্র-সড়ক'। তাতে সুবিধে অনেক। রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্তেরা অখুসি হবেন না, এবং হলপ করে বলছি যাঁরা ভক্ত নন তাঁরাও রাগ করবেন না। বরং পরিকল্পনার নতুনত্বে চমৎকৃত হয়ে ভারত সরকারকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাবেন।

মৃত পিতৃ-পুরুষদের স্মৃতি রক্ষার সংকল্পে আমাদের মাথায় খুন চেপে যায়। এ কথার কথা নয়, যথার্থ সত্য।

আমি যথার্থ স্মৃতি-রক্ষার কথা বলছি। যাঁদের স্মরণে আকালের দেশে পার্বণের সমারোহ চলে, ঘরে ও ঘরের বাইরে ফোটে শিকড়হীন রজনীগন্ধা, ধূপকাঠিতে আগুনের ছোঁয়ায় হাওয়ায় ছড়ায় সুরভি—সেই সব মৃত পিতৃ-পুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে কোন শ্রদ্ধাই সমর্থনযোগ্য। অবশ্য প্রশ্ন থাকে। সে আলোচনায় পরে আসছি। আগে ভাগেই বলছি, জয়ন্তীর নামে নাচ-গান-হল্লা যতই হোক, টিকিট বিক্রির নামে ব্যক্তিগত আয়, তবু বিস্মৃতির চাইতে এ ধরণের স্মরণ-সভা শ্রদ্ধেয় না হলেও উপভোগ্য। সান্ত্বনা এই যে, একেবারে ভোলেনি। হয়ত এ সমস্তই দৈনন্দিন জীবনের দুর্বহ দুঃখের, দৈন্যের যন্ত্রণার মুঠি থেকে চুরি করে নেয়া অবকাশের স্বল্প কয়েকটি মুহূর্তকে অন্যতর আনন্দে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা, অথবা ক্ষণ-কয়েকের পলায়ন। তবু মর্মান্তকভাবে সত্য এই যে, যে সময় নষ্ট করতে পারত গণবধূর নাচের আসরে, বড় হোটেলের অসংবৃত বেশ নটীদের কটাক্ষঘাতে, অথবা বেলেল্লাপনায় সমৃদ্ধ তথাকথিত হিন্দি ফিল্ম দেখে, তাঁরা যে এই স্মৃতির আসরে কাটাচ্ছেন এই সৎ-মনোভাবের মূল্য নেহাৎ স্বল্প নয়, এ আমি মানি। এবং নির্দ্বিধায় বলছি—এ মনোভাব আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার একটু নিবেদন আছে, একটি বিনীত অনুরোধ। আশা করি তাঁরা এ সম্বন্ধে ভাববেন।

টনটনে আত্মসম্মান জ্ঞান প্রতিটি মানুষের মধ্যে সচেতন বা অসচেতনভাবে থাকা সত্ত্বেও মানুষ সব সময়ে আত্মকল্যাণ চিন্তা করে অথবা করেছে এমনতর প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। যেহেতু মানুষের মনের, তার আশা-অকাঙ্ক্ষার কামনা-বাসনার ইচ্ছে-অনিচ্ছের গতিবিধির ধারা আজও কোন বিশেষ সূত্রজ্ঞান অথবা মহাজ্ঞান, বা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পুরোপুরি ধরা পড়েনি, সেহেতু ধরা যেতে পারে বিজ্ঞানকৃত সমস্ত সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক। সে কি মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, কি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত। তবে বিজ্ঞান মোটামুটি সাহায্য করেছে মানব মনের জটিলতার বহুতর বিস্তৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ায়। এবং এই জটিলতার জট খোলা কি পরিমাণ দুঃসাধ্য তার প্রমাণ সভ্যতার আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মহৎ চিন্তানায়কদের মত-বাদের বিপুলতা। মহৎ-জনের এত উপদেশ-আদেশেও মানুষের কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ মানুষ কি চায় তার হদিস। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একালের আমরা।

গত দিনেও যে বিশ্বাসের শিকড় মানুষের মনের গভীরতম তল পর্যন্ত ছুঁয়ে ছিল একালের আমাদের মনে তেমনতর দৃঢ় কোন শিকড় দূরের কথা, বিশ্বাসের ছায়ার অস্তিত্বও নেই। দুই মহাযুদ্ধে আমরা ভগবানকে হারিয়েছি। আজকাল আমরা যারা বিশ্বাসী বলে দাবি করি, আসলে অনেকেই করি অভ্যাসের সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। কেউ কেউ প্রবল পাপবোধের জোর-জবরদস্তিতে। বিশ্বাসে যে আন্তরিকতা নেই, তার প্রমাণ আমরা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে পারিনে, আত্মসমর্পণে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। এ আমাদের দুর্বলতা বা দৈন্যের দিক নয়, আসলে এ হচ্ছে স্ব-কালের ঘটনা সংঘাতের ফলে সৃষ্ট মানসিক প্রতিক্রিয়ার মারাত্মক ফলশ্রুতি। কারণ প্রত্যক্ষের মার বড় মার। তার ফলে বিশ্বাস অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মহৎ জ্ঞানের চাইতে মানুষের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছে তাব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এবং এই অভিজ্ঞতাই কথা বলে, কথা বলায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মানুষের চলার পথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তার পথ চলার পাথেয়। তাই শিক্ষা দীক্ষা বিশ্বাস সত্ত্বেও স্ব-অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে মানুষ কথা বলতে অরাজি। এই অরাজি মনোভাবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে অপরিসীম। বলাবাহুল্য সাধারণ মানুষেব কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। এর দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করি সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের জীবনে এই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাই সব নয়। আসলে মানুষেব জ্ঞানলাভেব উপায় দুই। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এবং যাহাদ্বাবা নিশ্চয়জ্ঞান হয়, যাকে আমরা প্রমাণ বলি তা শুধুমাত্র সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় লাভ করি না। ভারতীয় দর্শনের মতে নিশ্চয়জ্ঞান লাভের উপায় সাত। যথা—চাক্ষুষ অনুভব শব্দ সম্ভব উপমান অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি বা না দেখা। অবশ্যই এসব গভীরতর দিকের কথা। বরং নিজেদের কথাই বলি।

একালের মানুষ দেখেছে শুনেছে বুঝেছে অনেক। এবং নিত্য-নিয়মিত ঘা খেয়ে খেয়ে আজ তাদের বোধের রাজ্যে এসেছে ভীষণ অরাজকতা। তারা কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। অথচ দাঁড়ানর প্রয়োজন মানুষ মাত্রেরই জীবনে অপরিহার্য। অন্যথা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু তারা দাঁড়াতে পারছে না, কারণ বিজ্ঞান নিয়মিত ঘা দিচ্ছে, আর তাতেই বিশ্বাসের বেদী ভেঙে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান মানুষকে দিতে পারছে না কোন স্থির বা শাশ্বত সত্যের ধারণা।

গত কালের থিওরিকে মিথ্যে প্রমাণ করছে আজকের থিওরি। তেমনি আজকের থিওরিকে মিথ্যে প্রমাণিত করবে আগামী কাল। এর ফলে মানুষের মনে হচ্ছে কিছুই স্থিতিশীল নয়; সব কিছুই অনিত্য। এই বোধ মানুষকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। গত দিনের বিশ্বাস মূল্যবোধ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। মহাজ্ঞানীদেব মহৎ উপলব্ধি অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। তাঁদের কথায় কান ভিজলেও, মনে লাগছে না।

ইতিমধ্যেই কিছু সংখ্যক একালের বুদ্ধিজীব' হাঁক-ডাক শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের মতবাদের মূল কথা হল: "We ana things in general exit, and that is all that there is to this absurd business called life. জীবন তাঁদের মতে নিরর্থক কর্মের বোঝা। তাঁরা বলেছেন— মানুষের জীবন-সংগ্রামের প্রবণতা স্বভাবজ। এ সংগ্রামের পথ থেকে তাদের সবান যাবে না। কিন্তু এ নিরর্থক। যেহেতু যথার্থ লক্ষ্যে মানুষ কোন দিনই পৌঁছতে পারবে না। এই-ই হল মানুষের নিয়তি। তারা ক্লান্তিহীন ভাঙবে, গড়বে; অবশেষে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে আত্মহত্যা করবে, অথবা রুখে উঠবে এই অসহায়তার বিরুদ্ধে। ব্যস্ ওই পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়।

এঁদের কথা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু পুরো সত্য বলে মেনে নিলে মানুষের গত দিনের ইতিহাসং মিথ্যে হয়ে যায়। অভিব্যক্তি থাকে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ আর আজকের মানুষের বিরাট ব্যবধানই কি এঁদের মতবাদের বিরুদ্ধ সাক্ষী নয়? তাছাড়া, আজকের মানুষের মানসিক প্রবণতা যতই বিশৃঙ্খল হোক, জীবনকে absurd business বলে মনে করার মত অবস্থার মুখোমুখি এখনও আমরা হই নি। হয়েছি কি?

হয়ত এমনতর মানসিক অরাজকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন মহৎপাপী বলেছিলেন যে—If there is no God, he would have to be invented. যদি ভগবান না থাকে, তবে তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে। কারণ ভগবান মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ভগবানের বোধই মানুষের অগ্রগতির মূল কারণ। তাদের সংগ্রামের, নীতিবোধের, এমনকি সমস্ত দোষ-গুণের পেছনে কাজ করেছে অবয়বহীন ভগবানের অস্তিত্ব। আমাদের জীবনেও ঠিক তাই। বিশ্বাস বলে যদি কিছু না থাকে, তবে নতুন বিশ্বাস আমাদের সৃষ্টি করতে হবে—যে কোন বিশ্বাস। কারণ বিশ্বাস ছাড়া সৃষ্টি অসম্ভব।

বিশ্বাস ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। এবং তার জন্যে আমাদের শরণ নিতে হবে মহাজ্ঞানী পিতৃ-পুরুষদের। পাঠ নিতে হবে তাঁদের সমৃদ্ধ অনুভবের, সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতার। অংশীদার হতে হবে তাঁদের জ্ঞানের, বিশ্বাসের—আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার শত বিরোধ মেনে নিয়েও।

যে কথা দিয়ে সুরু করেছিলাম। যথার্থ স্মৃতিরক্ষা আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু সে স্মৃতিরক্ষা শুধুই নাম-তর্পণ, নাচ-গান-হল্লা বক্তৃতা অথবা রাস্তার নামকরণ স্মৃতিসৌধ গ্রন্থাগার মিউজিয়ম-প্রতিষ্ঠা এসব কিছুতেই নয়। জয়ন্তী উৎসবেও না। এসব আছে, থাক। কিন্তু আমরা যারা একেবারে অজ্ঞ নই, আমার নিবেদন, আমাদের প্রতিদিন থেকে যে কোন প্রকারে কিছু মুহূর্ত চুরি করে মহৎ পিতৃ-পুরুষদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতে হবে। নিতে হবে তাঁদের সৃষ্টির পাঠ, জ্ঞানের অংশ।

অন্যথায় আমরা মরব। আমাদের পরবর্তীরাও বাঁচবে না। তাই বলছি—চাইলেই আজকের বিশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থায় একবার মরা যায়। একবার মরা ভীষণ সহজ। কিন্তু নতুন করে বাঁচতে হলে বহুবার মরতে হবে—সে বাঁচা বড় কঠিন। তার জন্যে আমাদের একটি ভগবান সৃষ্টি করতে হবে।

ভগবান নয়—বরং বলি, স্থির বিশ্বাস।

১৯৫৮

লাল পিঁপড়ে ও বিশ-শতকীয় মানসিকতা

আমি যে অহিংস সে পরিচয় প্রথম দিয়েছিলুম আমার কৈশোরে। কুকুরের কামড়ে বিব্রত হয়েও কুকুরটাকে কামড়ানর কথা মনে হয়নি। তারপরে বয়স বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও। ইতিমধ্যে আরও অনেকের দংশনে আমার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। কখনও অহিংস প্রতিষেধক গ্রহণ করেছি, কখনও বা সহিংস প্রতিশোধ। এবং আজকাল মন ঝুঁকেছে প্রতিষেধকে নয়—প্রতিশোধে। এতে মনের দ্বিধা বিস্তর, তবু নান্যপন্থা। যেহেতু যারা কামড়ায় তারা কামড়ানর কথা ভুলে গেলেও যাকে কামড়ায় তার ভুলতে সময় লাগে। তখন দন্ত বিকাশেই দংশনভীতি। সুতরাং নিধনং শ্রেয়।

আমি লাল পিঁপড়ের কামড়ে কিছুদিন থেকে বিব্রত এবং ব্যথিত। এসব ক্ষুদে প্রাণীদের দাপটের বহর দেখে আমার স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে, উঠতে বসতে আমি নিরন্তর পিঁপড়ে দেখি, এবং পিঁপড়ে দেখলেই আঙুলের চাপে তাদের ভবলীলা ফুরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনে। অথচ এক সময়ে পিঁপড়েদের নিয়ে কাব্য করতে আমার বাধেনি। কবি অমিয় চক্রবর্তীর মত আমিও বলতাম :

'আহা পিঁপড়ে, ছোট পিঁপড়ে
ঘুরুক ফিরুক দেখুক ;
আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে
ধুলোর রেণু মাখুক।'

কারণ প্রাণ এদের পরিচয় এনেছে নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন সাধনের জন্যে। অতএব ঘুরুক ফিরুক এবং ধুলোর রেণু মাখুক। কিন্তু আজকাল পিঁপড়ে দেখলেই আমার বোধ-বুদ্ধি লোপ পায়। আমি হাতে পায়ে মারতে থাকি। বলি :

'পোড়ার মুখো লাল মুখোরা
পায়ের চাপে মরুক।'

কারণ এদের প্রতি আমি অহিংস হলেও ওদের সহিংসতা ঘুচবার নয়। ওরা সার বেঁধে বিছানায় মশারিতে চেয়ারে টেবিলে তেলমাখা চিরুনিতে তেলের

শিশিতে খাবার জিনিসপত্রে সার্টে কাপড়ে এমন কি পঁচিশ শীতে ক্লান্ত আমার এই শীর্ণ শরীরটার যত্রতত্র হানা দিয়ে বেড়াবে একা একা নয়, দল বেঁধে। যেন আমার শরীরটা ওদের ভোর-দুপুর সন্ধ্যের পায়চারির ময়দান। তদুপরি ওদের ভঙ্গিটা এমন, যেন পায়চারির এই অধিকার তারা জন্মসূত্রেই পেয়েছে। কাঁহাতক এ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়। অসহিষ্ণু হয়ে সহিংস হলেও এদের হাত থেকে রেহাই নেই। 'মরেও মরে না রাম'—এরা তেমনতর বৈরী।

আমি পিঁপড়ের বংশ বৃদ্ধির হিসেব জানিনে। জানলে এবং সে সংখ্যার বৃহৎ অঙ্ক দেখেও আমি বিস্মিত হতুম না। যেমন বিস্মিত হইনে মানুষের বংশ বৃদ্ধিতে। একের বংশ রক্ষার জন্যে একজনই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে মানুষের মত বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণীও যখন চার ছয় দশ বারোর সামা ছাড়াতে অক্লান্ত, তখন পিঁপড়েদের কথা বলাই বাহুল্য। অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন ভগবানের হাতে পিঁপড়ের মত ক্ষুদে প্রাণীরা যে মানুষের তুলনায় নিতান্ত অসহায়—তা কি বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে?

বিজ্ঞানের রাজ্যের পরমাণু শক্তির মতোই জীব রাজ্যের এ সব ক্ষুদে প্রাণীদের দাপটের প্রচণ্ডতা বিস্ময়কর। পিঁপড়েদের কথা বাদ দিলেও অদৃশ্য অদৃশ্য ক্ষুদে রাজাদের স্পর্ধার বহর কত, মানব সমাজের তা অজানা নয়। বহুতর দুরারোগ্য ও আরোগ্যসাধ্য রোগের আয়োজনের কর্মকর্তা ত এরাই। অদৃশ্য শত্রুরা উহ্য থাক, আপাততঃ আমার বক্তব্য লাল পিঁপড়ে—যারা দীর্ঘদিন আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেছে, এবং আমিও।

এরা অসংখ্য। শুধু অসংখ্য নয়, আশ্চর্য তাদের সংগঠন শক্তি, তাদের দলবদ্ধ মনোভাব, স্ব-সমাজনিষ্ঠা। তাদের দংশনে ব্যথিত বিব্রত হয়েও তাদের সঙ্ঘশক্তির প্রশংসা না করে পারিনে। আমি বিপুল এবং বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ভেবেছি—এ সঙ্ঘবদ্ধতার পেছনে কাজ করছে কি এদের অজ্ঞানতা, না গোষ্ঠী-সচেতনতা।

পিঁপড়ের মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লষণে আমি অক্ষম। বরং চোখের দেখার 'পরে ভরসা করে বল'ত পারি, অস্তিত্ব রক্ষার ক্লান্তিহীন সংগ্রামই এদের যুথবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। অবশ্য মানুষের মতো শক্তির বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হলে এদের মৃত্যু হয় শ'য়ে শ'য়ে—যূথবদ্ধতার এ হল খারাপ দিক। ভাল দিক হল—বিরুদ্ধতার মুখোমুখি না হলে এরা হাজারে হাজারে বাঁচে। এবং বাঁচার মত বাঁচে।

এখানেই আমার ভূমিকার ইতি।

সমুদ্র মন্থনে বিষ এবং অমৃত দুই-ই উঠেছিল। উঠেছিল লক্ষ্মী এবং উর্বশী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ পরস্পর বিরোধী দুয়েরই সাধনা করে আসছে। বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হবার স্পর্ধায় যেমন তার কমতি নেই, অমৃত পান করে অমরত্বের লোভও তার অপরিসীম। শিল্পচর্চায় মগ্ন হয়ে নিজেদের অতি সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তির পরিচয় যেমন দিয়েছে, বাড়িয়েছে বোধ ও বুদ্ধির ক্ষমতা, তেমনি লক্ষ্মীর আরাধনা করে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বকে। সমান্তরাল এই দুই সাধনা মানুষের আবহমান কালের। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি আমার যা বক্তব্য তাকে স্পষ্ট করার জন্যে তথ্যের খুঁটিনাটি বা তত্ত্বের টুকিটাকিকে প্রশ্রয় দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে, এবং সেই কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট বলতে পারি, গত শতকেও উপরোক্ত দুই ধারার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ (স্থূলার্থে) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এবং বাহুল্য জেনেও বলছি ক্লেদের কতকগুলি অনতিস্পষ্ট ধারাও পাশাপাশি বইছিল, গৌণ ভেবে যেগুলোকে উপেক্ষা করা গত শতকের শেষ দশকেও সম্ভব ছিল। মুখ্যতঃ মুখ্য দুই ধারাই বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধ্যাত্বকে নিশ্চিহ্ন করে নতুন জন্মের সূচনা করল। কিন্তু গত শতকীয় বিশ্বাস এ শতাব্দীতে খুব কার্যকরী হল না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক মানুষকে একেবারে চমকে দিল। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতা সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিকে নাড়া দিয়ে মূল্যবোধের নীতিবোধের পরিবর্তনে বাধ্য করল। পরিবর্তনশীল নীতিবোধ ও মূল্যবোধের আমূল সংস্কারে এগিয়ে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়ের মুখ পলকে খুলে গেল এবং স্পষ্টতঃ অনুভব করল সবাই, শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্জিত ক্ষমতার, দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মারাত্মক গতিবিধি।

মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির বিপুলতা আত্মশক্তিতে মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে সন্দেহ নেই, শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল এ কথাও সত্য। কিন্তু পাশাপাশি তার আসুরিকতাও ভয় পাইয়ে দিয়েছে ভীষণ ভাবে। তাতে সমাজের গোড়ায় ঘা পড়েছে। তাতে টলে গেছে সমাজের ভিত। সে টাল কিছুতেই সামলান যাচ্ছে না। বরং বলা যায় মানুষের অশুভ বুদ্ধি দ্রুত উদ্ভাবনের মাধ্যমে দ্রুততর ছুটে চলেছে আরও বৃহত্তর ধ্বংসের মুখে—যার শেষ নির্বিশেষ বিলুপ্তিতে। এবং সমাজ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েছে। গ্রামীণ ঘনিষ্ঠতা শিথিল হয়েছে, শহুরে

সম্পর্কে—ঘনিষ্ঠতাই নেই। যা আছে তা স্বল্পক্ষণের মুখ চেনাচিনি। তার ফলে পরিবারনিষ্ঠা হারিয়ে গেছে, এখন সবাই আত্মনিষ্ঠ। সবাই আত্মচিন্তায় মগ্ন। অজস্র 'আমি'র যূথবদ্ধতায় গঠিত যে সমাজ, সেই বৃহত্তর সমাজ-চিন্তা আর একালের মানুষকে তেমন করে ভাবিত করছে না। বৃহত্তর সমাজ ত দূরের কথা, অতি-ঘনিষ্ঠ যে রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন তাদের কথাও মানুষ বিস্মৃত হচ্ছে দিনে দিনে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার পরিণাম অশুভ জানা সত্ত্বেও এপথ কেউ ছাড়তে পারছে না, বাধা দিচ্ছে আর্থিক সংকট। সমাজ ভেঙেছে আগেই, ইতিমধ্যে পরিবারও ভেঙেছে, ভাঙছে।

তার চেয়ে গোড়ার কথা বলি।

ধনবুদ্ধি প্রবল হলে মানসিক বিকার স্বাভাবিক। তখন লক্ষ্মী অলক্ষ্মী হয়ে ওঠে, এবং অলক্ষ্মীর চাপে উর্বশী মরে। অবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় সে বিকৃতি যে কত প্রবল আকার ধারণ করে তার প্রমাণ আমাদের সমাজ। যুদ্ধের ফলে সমাজের একাংশে যেমন অর্থের সম্পদের অনুচিত প্রাচুর্য, অন্যাংশে তেমনি পুঞ্জীভূত দৈন্য। দিনে দিনে এই ব্যবধান-সীমা বেড়েই চলেছে। ফলে অনিবার্য সংঘাত। নিচের তলার লোকের মরিয়া চেষ্টা উপরে ওঠার, উপরের লোকের উদ্যম আরও উপরের। এমনতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে বিবেক বিশ্বাস ধর্ম নীতি বেনো জলে শ্যাওলার মতই ভেসে যাচ্ছে, আর মানব সমাজের বিরাট অংশ দ্রুত চলার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে হাফাচ্ছে, দুর্ভাগ্য তবু তারা থামতে পারছে না; বরং বলা যাক—থামতে দিচ্ছে না। এমনতর সর্বগ্রাসী সঙ্কটের মাঝগাঙে হাবুডুবু খাওয়া মানুষ শুধু মাত্র বাঁচার প্রয়োজনে পরিবেশ পারিপার্শ্বিক বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে মনে প্রাণে। স্ব-রাজ্যচ্যুত হয়ে বাসা বেঁধেছে পায়রার মত বিশ-শতকীয় আলো-ঝলমল শহুরে খোপে। দৈনন্দিন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিপর্যস্ত মন মাথা কুটে ফিরছে দেয়ালে দেয়ালে। অবশেষে অর্জিত সামান্যের বিনিময়ে স্বপ্ন দেখছে আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ মানসিকতার গজদন্ত মিনারে শুয়ে অসামান্যের।

আমাদের 'আত্মচিন্তা' ও ঋষি-উক্ত 'আত্মানং বিদ্ধি' এক পর্যায়ের নয়, এ-কথা বলা বাহুল্য। প্রথমের গণ্ডি আত্ম সুখ-দুঃখের হিসেব-নিকেশে, দ্বিতীয়ের পরম ও চরম তত্ত্বে—অর্থাৎ বৃহত্তর, মহত্তর কল্যাণ চিন্তায়।

আত্মসুখের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার ফলে আমাদের মানস-ভ্রমণ সঙ্কীর্ণতায়

গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে আত্মোন্নতি অর্থাৎ নিজে কি করে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠব এটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার, সামঞ্জস্যহীন সমাজ ব্যবস্থার তীব্রতম সঙ্কট মুহূর্তে একক চেষ্টায় অভাব অভিযোগের শতযোজন সমুদ্রে সেতু-বন্ধন অসম্ভব একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে স্পষ্ট। এ সেতু-বন্ধনের জন্যে প্রয়োজন যূথবদ্ধ চেষ্টার।

সম্মিলিত উদ্যম যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছোটবেলার একটি লাঠি ও দশটি লাঠির গল্পের পড়ুয়া মাত্রেরই জানা। আশ্চর্য, এই সঙ্ঘ শক্তি সম্বন্ধে মনে মনে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও আমরা একটি সূত্রে মিলতে পারছিনে। প্রথম কারণ, আমরা সমস্ত কিছুকেই বিচার করি আত্মসুখের পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের ঘাড়ে চাপান উদ্ভট কিছু মতবাদ আমাদের মনে ও কাজে একাত্ম হতে দিচ্ছে না। তৃতীয়তঃ আমরা বৃহত্তর সমাজ সম্বন্ধে দায়িত্ব এড়ানর জন্যে স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে থাকি। আসল কথা আমাদের অতি চতুর, অতিপ্রাজ্ঞ মনোবৃত্তি আমাদের প্রতিনিয়ত ঠকাচ্ছে। আত্মবুদ্ধির কূটচক্র থেকে বেরতে না পারলে আমাদের মুক্তি অসম্ভব।

প্রাসঙ্গিক বলেই বলা প্রয়োজন, যূথবদ্ধতার বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যক্তির পক্ষে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন আছে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে। এ কথা সত্য, ব্যক্তি-চিন্তাই সামাজিক রাষ্ট্রিক এমন কি সর্ববিধ পরিবর্তনের উৎস। কিন্তু আমরা যে সমাজের মানুষ সে সমাজে ব্যক্তির প্রভূত স্বাধীনতা বিপজ্জনক। কারণ ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তির সংখ্যাই এ সমাজে শতকরা নিরানব্বুই। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে শিক্ষিতের যে সংখ্যা আমরা জানি তার সাত দশমাংশই শুধু স্বাক্ষর সক্ষম। এমনতর অশিক্ষিত মানুষের হাতে স্বাধীনতার অর্থ বিকৃত হতে বাধ্য। এ ছাড়া সমাজে মানুষের আথিক মানও এত নিচু স্তরের যে স্বাতন্ত্র্য-চর্চার চাইতে যূথবদ্ধতাই এ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের লক্ষ্য যেহেতু পশ্চিম, যেহেতু তাঁরা ইউরোপ আমেরিকার চিন্তাশীলদের চিন্তায় প্রভাবিত সেহেতু তাঁরা ভাবেন না যে, ভারতবর্ষের সমাজ ও পশ্চিমী সমাজের পার্থক্য আকাশ পাতাল। অর্থনৈতিক অবস্থা একটি নির্দিষ্ট মানে না পৌছলে মানুষের হাতে ক্ষমতা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। ফ্রান্সে বৃটেনে আমেরিকায় বা অন্যত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন মুখ্য হওয়া স্বাভাবিক যেহেতু সেখানে শিক্ষা একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছেছে, এবং সেখানের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের

কলকাতার

তুলনায় অনেক উন্নততর। বরং বলা যায়, আমাদের দেশের সর্বব্যাপ্ত অভাব ও দৈন্যের এমন তীব্র রূপ তাদের স্বপ্নেরও অগোচর। সুতরাং পশ্চিমমুখিতা সর্বক্ষেত্রে শুভ নয়, এবং আমাদের সাথে তাদের তফাতও বিস্তর, একথা ভুললে কিছুতেই চলবে না। তাছাড়া মন-মুক্তির প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন দেহের (বাঁচার) প্রয়োজন মিটে গেছে। তার আগে সে প্রশ্ন উত্থাপনে বুদ্ধির পরিচয় থাকতে পারে, কল্যাণের নয়।

অতএব কল্যাণ যদি মুখ্য হয়, তাহলে প্রয়োজন যূথবদ্ধ হওয়ার। অবশ্য আমরা কোন না কোন ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিনে তা নয়। বিশেষ দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হই বটে, তবে সে উদ্যম সর্বাত্মক নয়। বৃহত্তর সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের নেতিবাচক মনোভাব জাতীয় জীবনের অসুস্থতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজনৈতিক দলের অথবা কু'চক্রী রাজনীতিজ্ঞদের দাবার চালের ঘুঁটি মাত্র না হয়ে আমরা যদি গভীরে ডুববার চেষ্টা করতাম তাহলে হয়ত আমাদের সমস্যার কিছু সমাধান সম্ভব হত।

১৯৫৮

নিখুঁত হবার চেষ্টার মধ্যে স্পর্ধার পরিচয় আছে। ভগবান স্বয়ং স্পর্ধার প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত বলেই হয়ত ভক্তদের ভাষায় বিশ্বসৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিকর্ম নয়, লীলামাত্র। 'লীলা' কথাটায় একটু অগোছাল খেয়ালীপনার ভাব বর্তমান। এ যেন ইটের পরে ইট গেঁথে পরিকল্পনা মত গড়া নয়, খেলাচ্ছলে অনেকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এলোমেলোভাবে হয়ে ওঠা। 'গড়া' এবং 'হয়ে ওঠা'—এ দুয়ের পার্থক্য বিস্তর। একটাতে বিষয়ী মানুষের অঙ্কের হিসেবী সঙ্কীর্ণতা, অপরটিতে জাতশিল্পীর খেয়ালী বেহিসেবীপনা। ববং বলা যায়, প্রথমেব মধ্যে পালোয়ানী বুদ্ধির সচেতন বিহার, দ্বিতীয়ের মধ্যে অনাবিল হৃদযানন্দেব অবাধ বিস্তাব।

আপন খেয়ালের দাসত্ব করার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছে মানুষের স্বভাবেও। প্রযোজনের খবরদারিকে অবহেলা করে নিষ্প্রয়োজনেব খুদ কুঁড়োতে মেতে থাকতে সে ভালবাসে। ফলের লোভকে আলতে হাতে সরিযে রেখে তাই বুঁদ হয় ফুলের নেশায়। সে চায আপন স্বভাবে হয়ে উঠতে এবং তার স্বপ্নকে হযে ওঠার সুযোগ দিতে। কিন্তু প্রযোজন যখন সবকিছুকে ছাপিযে ওঠে, তখন স্বভাবের বেহিসেবিপনাকে বাধ্য হযেই বিদায নিতে হয়। তখন প্রযোজন ডিঙিযে যায় মানুষটাকে। এতে মানুষটা মরে, যে-মানুষ অসম্ভব সম্ভাবনার আকব, যার ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ততব বিকাশে বৃহত্তর কল্যাণ সম্ভব হত। বাঁচে শুধু দেহটা, যে-দেহকে সহস্রেব ভিড়ে আলাদা করে চিহ্নিত কবা যায় না; যে সহস্রেব মধ্যে সাধারণ এক। মানুষেব সমাজে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে কোথায় যেন ভাগ্যেব নিষ্ঠুর বিদ্রূপ প্রচ্ছন্নভাবে মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে। তার অগ্রগতির কোথায যেন একটা পিছটান আছে, যার জন্যে মানুষের প্রার্থিত মুক্তি, যে-মুক্তি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কুশলতায সুন্দর; সে-মুক্তি তার হাতের নাগালের বাইরে। আমার অনুমান হয়ত মিথ্যে, তবু মনে হয় অত্যন্ত পরিকল্পনা প্রবণতাই মানুষের মুক্তির প্রতিবন্ধক। নিখুঁত করে গড়ে তোলার ইচ্ছার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের আত্মঘাতী সর্বনাশ।

সহরের সাজান বাগানে মালির বহুতর পরিচর্যার মনোহারী ফুল ফোটে না তা নয়, হয়ত অনেক সময়ে সে-ফুল আয়তনে এবং রূপে বিস্ময়ের সৃষ্টিও করে, কিন্তু প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশের যে শুচি-সৌন্দর্য, যত্নের বহুল প্রলেপে তা নষ্ট হয়ে যায়। কৃত্রিমতাকে তখন রূপ বলে ভুল হয়, চমককে সৌন্দর্য। যদি মেনে নেয়া যায় বহুতর নিয়মের মধ্যেও বেড়ে ওঠা সম্ভব, সেখানে আমার বক্তব্য হল এই যে, সাজান বাগানের সবটাই মালীর কেরামতি নয়, অনেকটা তার যত্ন-আত্তির অবকাশে গাছের আপন মনে হয়ে ওঠা। আসলে সারাক্ষণের খবরদারি মূক বৃক্ষও সহ্য করে না, প্রতিবাদে সে মরে।

মানুষের ইতিহাসেও এই প্রতিবাদীর সংখ্যা স্বল্প নয়। আইনের নীতির ধর্মের সংস্কারের শৃঙ্খলকে উড়িয়ে দিয়ে মুক্ত হতে যাঁরা চেয়েছেন তাঁদের অনেকেই বরমাল্য পেয়েছেন পরবর্তী মানুষের সত্য, কিন্তু তাতে মানুষের বন্ধন-মুক্তি সম্ভব হয়নি। কারণ মানুষের বুদ্ধি মানুষকে যে অক্টোপাসি বন্ধনে দিনে-দিনে কালে কালে বেঁধেছে তাকে দু একজনের বিরোধিতায় নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল করা অসম্ভব। সংশোধন হয়েছে, সংস্কারও হয়েছে পুরোন নিয়ম-নীতির; পাশাপাশি নতুন নিয়ম-ধর্ম ধ্বজা উড়িয়ে জায়গা জুড়েছে। এতে বন্ধন ঘোচেনি এবং মুক্তিও আসেনি, তার প্রমাণ একালের আমরা।

সমাজকর্তাদের কাছে সমাজনীতির মূল্য যতটুকু, সমাজের ওপরতলা থেকে নীচুতলার অজস্র অভিভাবকদের কাছে তাঁদের বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত নিয়ম-নীতির মূল্য কণামাত্র কম নয়। জন্মের পর থেকেই সংখ্যাহীন খবরদারির ভেতর দিয়ে যার বেড়ে ওঠা তার পক্ষে স্বাধীনতা কি মূল্যহীন নয়? নিজে যে নিজের অধীনতা মেনে নেব সে আমি নিজে কে? আমার একান্ত আমি কি? তা ত নয়। পিতা-মাতা গুরুজন থেকে সুরু করে মাস্টার মশায় নীতিবাগীশ এমনি অজস্রের ভাল-মন্দের বোধ আমার মধ্যে কাজ করছে নিত্য-নিয়ত। সেগুলো কখনও আমাদের স্বভাব চলায় বাধার সৃষ্টি করছে, কখনও ঠেলে দিচ্ছে দুঃখের হতাশায়। এমনতর টানাছেঁড়ার মধ্য দিয়ে যে আমি আমার কাছে স্পষ্ট, সে আমিও মানুষের ভেদবুদ্ধি, মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের চাপে পড়ে প্রতিদিন আর্তনাদে আকাশ ফাটাচ্ছে। নয়ত মুখ বুজে মার খেয়ে চলেছে, এবং ধিক্কার দিচ্ছে ভাগ্যকে, দোষারোপ করছে দুর্লভ মানব জন্মকে।

ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানুষের পথ চলাকে সহজ করে না, বরং জটিলতা বাড়ায়। সেজন্যে সর্ব বিষয়ের মত জ্ঞানেরও সংযম প্রয়োজন। বাড়তে দিলে অনেক কিছুই বাড়ে, কিন্তু সে বাড়া নিরর্থক যাতে অকল্যাণ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে সীমাটানার সুন্দর দৃষ্টান্ত তার ঋতুরঙ্গ। অবিমিশ্র বর্ষণে যেমন তার দ্বিধা, খাণ্ডবদহনেও তার সমান অনিচ্ছা। আবার উত্তুরে হাওয়ার যেমন সীমা আছে, তেমনি দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণও অপরিসীম নয়। মিতাচার যে অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় ছড়ান-প্রকৃতিতেই তার মৌন সমর্থন বর্তমান। তার আয়োজনে যেমন বিপুলতা নেই, তেমনি সমারোহেও বাড়াবাড়ি নেই। জীবরাজ্যে মানুষ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হয়েও এই মহৎ শিক্ষা থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। হিসেবি বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ ঐশ্বর্যের সঞ্চয় বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই, লক্ষ্মীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বরমাল্য। জ্ঞানের অপরিমিত অধিকারে সরস্বতীর শিরোপাও মিলেছে; কিন্তু মানুষ হারিয়েছে তার বোধের বিবেকের আত্মার রসগ্রহণের ক্ষমাসুন্দর ঐশ্বর্য। হয়ে ওঠা থেকে গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলাই আজ তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এ গড়ে তোলার জন্যেই বুদ্ধির ফাঁদ পেতেছে চারিদিকে, খবরদারির পালোয়ানীতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

আর একটু স্পষ্ট করা ভাল।

মানুষের জ্ঞান যতদিন পর্যন্ত শ্রুতি নির্ভর ছিল ততদিন তার বিপুলতা সীমা ছাড়ায়নি। লেখার অবিষ্কার থেকে সুরু করে ছাপাখানার উদ্ভাবন মানুষের আবিষ্কারকে মহত্বের মর্যাদা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিপদ এসেছে অন্যদিক থেকে। জ্ঞানের বিপুল প্রয়াস লিপিবদ্ধ হতে হতে আজ বিপুল আকার ধারণ করেছে শুধু নয়, শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে বিশালকায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়ের বহু বিভাগ, ফলে জ্ঞান অর্জনের সীমা সীমানা কোথাও নেই। বহু-বিচিত্র মানুষের বহুতর জ্ঞানের রাশিকৃত পুস্তক কোন মানুষের একজন্মে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, অথচ সত্যকে স্পর্শ করার জন্যে বিশ্ববীক্ষা অনিবার্য। খণ্ডিত জ্ঞান খণ্ড-সত্যকে প্রতিফলিত করে, অথচ একটি মানুষের পক্ষে একটি বিষয়ে যথার্থ পারদর্শী হবার জন্যেই একটি জীবন যথেষ্ট নয়। ফলে বিজ্ঞানীর বক্তব্যে আর অর্থনীতিবিদের বক্তব্যে, অথবা সমাজ বিজ্ঞানীর সাথে ইতিহাসবেত্তার মতের কোথাও মিল হচ্ছে না। এমন কি একই বিভাগের দশজন দশটি পরস্পর বিরোধী সত্যের মুখোমুখি হচ্ছে। লাভ হয়েছে এই, যথার্থ সত্য

সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। অসংখ্য নির্দেশ দিচ্ছেন—এই কর, সমসংখ্যক বলছেন—না, এই কর। এই বিরোধের কোথায় যে সীমা তা কেউই জানে না।

পরিমিত শক্তিতে অপরিমিতের ভার বহন অসম্ভব। অথচ এ সহজ সত্যে মানুষের আস্থা নেই। তার বিরামহীন ছোটা গ্রহের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রহান্তরে ছুটেছে। বাহবার কোন কমতি নেই। চারিদিকে অপরিমিত অভিনন্দন আর মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

প্রতিটি দিনের নিত্য-নতুন সব কিছুতেই আমাদের অন্তহীন বিস্ময়। অণু-শক্তির প্রথম আবিষ্কার লগ্নেও আমরা বিস্মিত হয়েছি, কিন্তু সে বিস্ময় আরও চমকিত করেছে যখন হিরোসিমায় আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে তার ধ্বংসক্ষমতা। আজকের গ্রহান্তরে যাত্রাও আমাদের তেমনতর বিস্ময় উপঢৌকন দেবে কিনা জানিনে, যদি দেয় মর্মাহত হব না। মানুষের ইতিহাস হয়ত এরই জন্যে এত অন্তহীন পথ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে একালের সীমায়।

শয়তানের হাতে মানুষের আত্মা আজ বিক্রিত। মহত্তর কল্যাণের জন্যে যে বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়েছিল মানুষ, সে বিজ্ঞান জানিয়ে দিয়েছে তার হাতে চাবিকাঠি নেই। সেও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অক্ষম। বিজ্ঞানীরা বলছেন—মানুষের জ্ঞেয়ের চাইতে দুর্জ্ঞেয় এখনও অসীম। এবং প্রকৃতির সেই পরম ও চরম সত্তার রহস্য উন্মোচনের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কারণ বোধের জগতের পেছনে যে বাস্তবের অস্তিত্ব বর্তমান তাকে উপলব্ধি করার জন্যে, তার খুঁটি-নাটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করার জন্যে যে ছবিই কল্পনা করা যাক না কেন তাকে যথার্থ প্রত্যক্ষ করা মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁরা সংশয়ী হয়ে উঠেছেন, ফলে বিজ্ঞান-কৃত কার্যকারণবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বলছেন—পরমাণু জগতের কোন ঘটনার আগামী ধারা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত করতে হলে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা প্রয়োজন, মানুষের সীমিত ক্ষমতায় তা অসম্ভব। তাই যার বর্তমান অনির্দিষ্ট তার ভবিষ্যৎ ধারা নির্ণয়ের প্রশ্ন অবাস্তর। তাঁরা বলছেন—নিয়তিবাদের প্রতিপক্ষ বলে কিছু নেই। চেতনজগতের অতীত এক নিয়তি কোথাও আছেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানও মায়াবাদের ফাঁদে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে।

এর ফলে স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাই মিথ্যে হতে চলেছে, এবং বস্তুজগৎ প্রাণিজগৎ এককথায় বিশ্বের সব কিছুই এক সীমাহীন অনির্দিষ্টতায় পা বাড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে আমরা কি তবে কারও অঙ্গুলি নির্দেশে বিশ্বের যত্র তত্র পুতুল নাচের মহড়া দিয়ে চলেছি? যদি তাই-ই হয় তাহলে মার খাওয়া ছাড়া মানুষের নিস্তার নেই। তাহলে অস্তিত্ববাদীদের মতই সত্য হবে—মানুষ খাটবে ভাঙবে গড়বে চেষ্টা করবে বন্ধন মুক্তির, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হতাশ হবে। তাঁরা বলেছেন—এ জীবন নিরর্থক কর্মের বোঝা। পড়ে মার খাওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই। প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌছন তার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ মুক্তি নেই। কর্মের প্রহারে জীবন পাংশু হবে, হাহাকারে বিদীর্ণ হবে আকাশ, আর্তনাদে বিষিয়ে উঠবে দিন; নির্মম নিয়তি তবু নাচার। তাঁর পুতুল নাচের আসরে সেজেগুজে নাচব তাঁর ইঙ্গিত মত, এবং পট-পরিবর্তনে আমরা হারিয়ে যাব। ব্যস্ খতম্।

তবু দ্বিধা কোথায় যেন আশ্বাস হয়ে বাজছে। মানুষের ভাগ্যে এমনতর দুঃখ আছে একথা বিশ্বাস করতে তাই মন অরাজি। বেঁচে থাকার, বেঁচে আছি এ যে মানুষের জীবনে কতবড় বিস্ময়, কী বিপুল আনন্দ; চারিদিকের এই আলো-হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়ার কি অপরিমিত স্বস্তি, হোক না দৈন্যের দুঃখের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন যাত্রা। তাই মনে হয় এত উদারতার অন্তরালে যিনিই থাকুন মানুষের ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর খেলাই যদি তাঁর ইচ্ছে তবে ব্যর্থ তার উদ্যম, মিথ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ এই বৃহৎ বিশ্ব-মেলায়। এই নির্মম খেলায় কি পাবেন তিনি, কি সার্থকতা তাঁর এমনতর আয়োজনে?

যদি ধরে নিই এ বিশ্ব কারও বীক্ষণাগার তাহলে মানুষের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, তার প্রচেষ্টাকে কলঙ্কিত করা নিরর্থক, যেহেতু আমরা অন্যের ইচ্ছাধীন। যদি মনে করা যায় বিশ্ব-সৃষ্টি কারও লীলামাত্র, তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী আমরাই। পরস্পরবিরোধী উপকরণের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে বাছাই এর মহৎ দায়িত্ব মানুষের। সেখানে মানুষের হঠকারিতা কাজ করেছে বলেই মানুষের এই দুঃখ। অর্থাৎ হয়ে ওঠার সুযোগকে আমরা নির্মূল করে গড়ে তোলার যে চেষ্টা অহরহ করছি, তাতে মানুষের আত্মা বিকৃত লোভের ফাঁদে নিজেকে নিঃশেষ করেছে। এ লোভ আত্মঘাতী। ফলে নিখুঁত হওয়া সম্ভব হয়নি, অথচ স্পর্ধার প্রকাশে কার্পণ্য করিনি আমরা।

সে প্রকাশ নিজেদের ছককাটা পরিকল্পনায়। কিন্তু এ করলে ও হবে এমনতর স্বতঃসিদ্ধতা আজ ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে, অথচ সিদ্ধান্ত করার মোহ আজও আমাদের অটুট। হয়ত সেই সিদ্ধান্তমগ্নতায় সমূহ চিড় ধরবার আগেই মানুষের সর্বনাশ সম্পূর্ণ হবে।

আমার অনুমান মিথ্যে হোক, এ কামনা আমারও। তবু বৃহৎ সর্বনাশের সম্ভাবনায় আজ যদি সংশোধনের এখনও যেটুকু পথ খোলা আছে সে-পথে চলার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেত, হয়ত সান্ত্বনা পেত মন। কিন্তু সে-আশা ফলবতী হবে তেমন সৌভাগ্য শূন্যে প্রাসাদ রচনার মতই মিথ্যে কল্পনা বলেই মনে হয়। হয়ত এই দুর্ভাগ্যই মানুষের ললাট-লিপি। হয়ত এমনতর সর্বনাশই তার কাম্য। নইলে এত ত্বরা কেন? কার আগে কে পৌঁছবে তা নিয়ে এত রেষারেষি?

কিন্তু মানুষ কোথায় পৌঁছবে? কোন্ লক্ষ্যে? সে কি নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যুর অন্তহীন অন্ধকারে, না কি জীবনের সূর্যালোকে ঝলমল সিংহদ্বারে?

যেখানে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমরা ইতরজনেরা উপায়হীন, সেখানে বরং প্রার্থনাই করি—সেই প্রতীক্ষার প্রহর আমাদের অফুরন্ত হোক॥

১৯৫৯

জলবায়ুর গুণেই বাঙালীর মানসিক প্রবণতার পক্ষপাত যুক্তির চাইতে ভক্তিতে। তাই তান্ত্রিক বামাচারে তাদের যেমন নিষ্ঠা, তেমনি শুধুমাত্র নামোচ্চারণে-সম্ভব মুক্তির উল্লাসে উর্ধ্ববাহু হতেও তারা অকুণ্ঠ। একটু খোলামেলা, একটু ঢিলে-ঢালা দুলকি চালটাই স্বভাবে, ছড়িয়ে ছিটিয়েই যেন স্বস্তি। ফলে বাস্তবের কড়াকড়ি, বরং বলা যাক প্রয়োজনের আঁটসাঁট বাঁধুনিতে স্বাভাবিক ভাবেই হাঁফিয়ে ওঠে। এমন ঢিলেমির প্রশ্রয় বাঙালীর জীবন যাপনে, আদর্শে এবং অনুশীলনে। ঠাট্টাচ্ছলে অথবা গাম্ভীর্য সহকারে যারা বলেন, বাঙালীর স্বভাবে কাব্যিয়ানা অথবা এদেশ কবিতার দেশ—তাঁদের কথা সর্বাংশে মিথ্যে নয়। স্বভাবের এই ঐশ্বর্যের জন্যেই হোক, অথবা দৈন্যের ফলেই হোক—শহুরে শৃঙ্খলা রক্ষায় বাঙালী অপটু, ব্যবসায়ে বাঙালীর কুশলতা সীমাবদ্ধ এবং হিসেবি পা ফেলতে বাঙালী আজ পর্যন্ত অক্ষমতার পরিচয়ই দিয়েছে।

খনিজ পণ্যে নয়, কৃষিজ ফলনে বাঙলা দেশের সমৃদ্ধি দীর্ঘদিনের। কৃষি নির্ভর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরদিন মাটির রসে পুষ্ট বলেই তাদের ইচ্ছেয় বেহায়াপনার প্রশ্রয় ছিল স্বল্প। ফলে স্বস্তি এবং সুখের প্রাচুর্য না থাকলেও অসন্তুষ্টির মাত্রা সীমাবদ্ধই ছিল। সাধারণ সহজ সুখেই ছিল তৃপ্তি। এবং সে-তৃপ্তিতেই প্রচুর অবকাশকে ভরিয়ে তুলেছে ভক্তিরসে। সে ভক্তির প্রকাশ কখনও পয়ারে, কখনও লাচাড়ী ত্রিপদীতে। বাঙালীর অতিপ্রিয় দুটি ছন্দের চলনও ঢিলে, চাল দুলকি। প্রকাশ আন্তরিক বলেই স্বভাবের এই ছাপ বিস্মিত করে না।

গ্রাম বাংলার পুঁথি পত্র, বাঙালীর অবকাশের পরিচয় বহন করে, এবং সেদিনের বাঙালীর মননশীলতাকে স্পষ্ট করে। দ্বিধা না করেই বলা যায়, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যমে সৃষ্ট পুঁথি-পত্রের বহুলতা যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে বিস্ময়কর। বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চার কথা উহ্য রেখেও, হাজার বছর আগের চর্যাপদ থেকে মুসলমানি আমলের অন্তপর্ব

পর্যন্ত ছন্দোবদ্ধ রচনার সংখ্যা অসংখ্য। এখনও গ্রমাঞ্চলে পাঁচালী, পুঁথি, পদাবলীর কবিতা সর্বোপরি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদির বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্যণীয়। যে গদ্য-সাহিত্য একালের পাঠকের মনোহরণ করেছে বিষয় বৈচিত্র্যে, সেই গদ্য-সাহিত্যের পত্তন মাত্র সেদিনের কথা। ইংরেজ আমলের সুরু থেকে ইংরেজ ও ইংরেজি সাহিত্যের সহযোগিতায় তার যাত্রারম্ভ। তার আগে দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য বৈষয়িক কাজে গদ্যের নাম মাত্র প্রচলন ছিল। গদ্য যে কারবারি ভাষা, এবং তার প্রতিষ্ঠা যে যুক্তিতে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

একালের গদ্যের বহুতর অগ্রগতি সত্ত্বেও কবিতার মহত্ত্ব একেবারে খর্ব নয়। গদ্য যদিও কাব্যের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে তবু মানুষের তীব্রতম যন্ত্রণার, গভীরতম আবেগের অন্তরতম উপলব্ধির এবং আকুতির যথার্থ প্রকাশ আজও হয় কাব্যেই। গদ্যে মানুষের মনের কথার আশ্চর্য বেগময়তা আজও অ-ধরা। কারণ আবেগের বাহন স্পষ্টোচ্চারী ধ্বনি ও ছন্দ। সর্বোপরি মনের গূঢ়তম বোধকে শব্দের সূক্ষ্ম ব্যবহারে ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ করতে পারে কবিতা; গদ্য এখনও সে স্তরে পৌছয়নি, যেহেতু ধ্বনি সর্বস্ব তালে-লয়ে শব্দকে শব্দাতীতে পৌছনর চাবিকাঠি কবিতার হাতেই। গদ্যর ছন্দ নেই তা নয়, ধ্বনিও বর্তমান, তবুও গদ্যের চরণ অর্থ প্রধান বলেই অনেকটা আপেক্ষিক; কানের উপেক্ষণীয় হয় বহু সময়েই। কবিতায় কিন্তু মাত্রা ভাগ ও ধ্বনি প্রাধান্য স্পষ্ট। তাই শব্দ ঝংকার স্পষ্টোচ্চারী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি।

"পাহাড়ের নীলে আর সাগরের নীলে,
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালী।
হলুদ ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।"

অথবা

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

গদ্যে কি এ অনুভবের প্রকাশ এমন মনোহারী হওয়া সম্ভব? এমন ধ্বনিপ্রাণ ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ?

কবিতা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মনের সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে। অথচ একালে তার ক্ষমতার খর্বতা লক্ষ্য করার মত। তার জনপ্রিয়তা মুষ্টিমেয় সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী পাঠক মহলেই সীমিত। একালের পাঠকেরা গল্প উপন্যাসের রমনীয়তায় মুগ্ধ, অথচ কাব্যপাঠে তাদের দারুণ অনীহা।

এ কথা অত্যন্ত সত্যি, কবিতার রসগ্রহণের জন্য প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন। কবিতা—পদ্য নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু। শব্দে ছন্দে ধ্বনিতে চিত্রে উপমা উৎপ্রেক্ষা ও অলঙ্কারে অত্যন্ত সাদামাঠা ভাবনাও যখন ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ হয়ে সং অনুভবের বিচ্ছুরণে দিগ্বিদিক আলোকিত করে তোলে, তখন জন্ম হয় কবিতার। কবিতার সঙ্গে তুলনা চলে ফুটে ওঠা ফুলের সজীবতার। তাকে গড়া চলে না, হয়ে ওঠে। এমনতর যে বস্তু, বিনানুশীলনে তার অন্তর্লীন রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। একালের পাঠক বহুতর ব্যস্ততার ফাঁকের খণ্ড অবকাশকে সাহিত্য-পাঠে ফুরতে চায় বলেই হয়ত কাব্য তাদের আকর্ষণ করে না। অবশ্য গল্পাদি পাঠের জন্যে যে অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না তা নয়, তবে পাঠকেরা অনেক সূক্ষ্মতম বস্তুকে বাদ দিয়েও নিটোল একটি গল্প পায় বলেই হয়ত গদ্যের কিছু কিছু বিভাগ অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিছু বিভাগের এ জনপ্রিয়তা পাঠকের অপরিণত মনের পরিচয় বহন করে। এই ইম্‌ম্যাচুয়রিটি অপ্রশংসনীয়।

কবিতা শুধু নয়, সাহিত্যের এমনতর বহু বিভাগ আছে যা গল্পের বাহন মাত্র নয়। তাদের ভাবনা-চিন্তার বিষয়ই আলাদা। সে সমস্ত বিভাগের অনুশীলনে রুচির রসের, সর্বোপরি মননের উন্নতি হয়। তাতে মননের ক্ষমতা বাড়ে, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সহজ হয়, জীবন ও জগতের উপলব্ধিকে স্পষ্ট করে। তার চেয়ে বলি, সূক্ষ্মতম ভেদও ধরা পড়ে বলেই বাছাই এর কাজ সহজ হয়। এ কথাগুলো বললাম মহৎ উপকার বা বিপুল উন্নতির গ্যারান্টি হিসাবে নয়, এ কথাগুলো উল্লেখের কারণ মানুষ জীবজগতে যথার্থ বোধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন বলেই বিশিষ্ট। এবং এ-বিশিষ্টতার স্বাক্ষর তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের উর্ধ্বের মহৎ মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করার মধ্যে, তার সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, তার নিরন্তর উন্নতির চেষ্টায়। যদিও উন্নতি মানে আর্থিক মাত্র নয়, আত্মিকও। কিন্তু এ কালের মানুষের মনোভঙ্গিতে প্রয়োজন যত জায়গা জুড়েছে তেমন যেন আর কিছুই নয়। শুধু মাত্র খুঁদ-কুড়োর বিনিময়েও অস্তিত্ব রক্ষাই তার মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, অবশ্য অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অন্য চিন্তা নিশ্চয়ই মূল্যহীন

 কলকাতার

হয়ে পড়বে এ স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব কি এতই বিপন্ন? এ অন্য প্রসঙ্গ। তবু সংক্ষেপে বলি, সামাজিক অব্যবস্থায় আমাদের মানসিকতা বিপর্যস্ত হলেও আমাদের উদ্বেগ আনুপাতিক হারে তার চাইতে বেশি। আকাঙ্ক্ষার এ অসংযম মনুষ্যোচিত নয়। আমাদের প্রয়োজনানুপাতে আমাদের চাহিদার পরিমাণ অমানুষিক। এ বিকৃতি। এবং বিকারগ্রস্ত মানুষের কাছে কবিতা পাঠে আত্মিক উন্নতির চাইতে অমানুষিক লোভের তাগিদে যেন তেন প্রকারেণ আর্থিক উন্নতি অবশ্য কামনীয়।

এ ত গেল একদিকের কথা। আবার কবিতা পাঠে উৎসাহী পাঠক সম্প্রদায় উল্টো প্রশ্নও তুলতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন—দীর্ঘদিনের সহৃদয় অনুশীলন সত্ত্বেও যদি এ-কালের কবিতার রস গ্রহণ অসম্ভব হয়, যদি অবোধ্যতার পাঁচিল ডিঙন কিছুতেই সম্ভব না হয়, তাহলে?

সঙ্গত প্রশ্ন সন্দেহ নেই। সদুত্তর দেবার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। কারণ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের জন্ম-লগ্নেই কিছু বিশৃঙ্খলার ইতিহাস আছে। আগে সেটাই স্পষ্ট করি।

অনুভব যদি স্বভাবের সৎ-পণ্য না হয় তাহলে ভঙ্গি-প্রাধান্য অনিবার্য। ভাবের কৃত্রিমতা তখন প্রকাশকে জটিল করে, স্বভাব হারায় সহজ স্বাভাবিকতা। এবং দীর্ঘ দিন ধরে এমনতর অভ্যাসের অনুশীলনে এই অ-সৎ প্রচেষ্টা সৎ-এর স্বত্ব দাবি করে। অ-স্বাভাবিক স্বাভাবিকের ভ্রম সৃষ্টি করে। পরবর্তীরা একেই সত্য ভেবে পা বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তিরিশের তরুণরা রবীন্দ্রনাথের সাজান বাগানে ভোর-সন্ধ্যে পায়চারী করতে করতেই অনুভব করেছিলেন—তাঁর বিশাল বাগানে সব ফুলেরই আসর পাতা। ফলে নতুন ফুলের বাগান করে টেক্কা দেয়া অসম্ভব জেনেই সিদ্ধান্তে এলেন যে বাগান তাঁরাও করবেন, তবে ফুলের নয়, ফুলহীন পাতাবাহারেরও নয়, যেহেতু পাতাবাহারের চাষ করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন প্রদর্শনী খুলে বসেছেন। অগত্যা তাঁরা ঠিক করলেন বাগান করবেন ক্যাক্টাসের। অবশ্য নতুন কিছু করিয়েদের পক্ষে এ ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের সাধনালভ্য কুশলতার মোহ কাটানর পথ তাঁদের মতে ছিল তিনটি। একটিতে সত্যেন্দ্রনাথ আগেই ঢুকে পড়ে ছন্দের বহুতর বেলুন সৃষ্টি করে চলেছিলেন। অন্য দুটি পথের একটি হল রবীন্দ্র-ভঙ্গির অনুকরণে রবীন্দ্রগত হওয়ার স্বস্তি,

অপরটি স্বভাব ধর্মের উল্টো পথে বিরোধিতায় অস্বীকার। প্রথম পথে আত্ম-ঘাতীর দৃষ্টান্ত তখন সম্মুখে ছিল বলেই 'ধুত্তোর রবীন্দ্র ঠাকুর' বলে তাঁরা দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করলেন।

গত তিরিশ বছর তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গেই সে-পথে চলেছেন, এখনও চলছেন। ইতিমধ্যে বিরোধিতার প্রাথমিক উত্তেজনার উগ্রতা অবসিত এবং সচেতন রবীন্দ্রানুরাগের স্পষ্ট স্বীকৃতির ফলে তাঁরাও কাব্যানুরাগী মহলের একাংশ কর্তৃক স্বীকৃত। অর্থাৎ দেশ-বিদেশ থেকে ক্যাকটাসের চারার বহুতর আমদানী সত্ত্বেও যখন বাগানের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হল না তখন তাঁরা কিছু কিছু ফুল গাছকে বাগানে প্রবেশের ছাড়পত্র দিলেন, ফলে তাঁদের অর্থহীন বাগাড়ম্বর, উদ্ভট উপমা ব্যবহার, অসংলগ্ন ভাব-ভাবনার ও চিত্রকল্পে সৃষ্ট কথামালার পাশ কাটিয়ে কিছু সংখ্যক সমৃদ্ধ-সৃষ্টি পাওয়া গেল যা বাঙলা কাব্যের সমৃদ্ধির সহায়ক। নতুন কিছু করার ঝোঁকে বিদেশিনীদের যেভাবে সাড়ি পরিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, খাটো চুলকে লম্বা করার এবং গৌরীদের যথার্থ রঙ বুলিয়ে শ্যামলী করার দায় না মেনে হৈ-চৈ সুরু করেছিলেন, তাঁদের সেই মানসিকতার ফাঁকে ফাঁকের ক্লান্তি-লগ্নে কিছু সংখ্যক শ্যামলী বাঙালীনী আমরা পেয়েছি, এ তাঁদের কৃতিত্ব এবং আমাদের সৌভাগ্য। অবশ্য তাঁদের গ্রন্থে গৌরীরা যেভাবে জায়গা জুড়েছে, শ্যামলীদের খুঁজে বের করা সত্যি কষ্টসাধ্য। তবু সত্য এই, সংখ্যায় স্বল্প হলেও তাঁদের দান উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ একবার তিরিশের একজন কবিকে তিরিশেরই অন্য একজন কবির কবিতার মর্মোদ্ধার করে দেবার জন্যে শিরোপা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেদিন প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞতাকে তিরিশের কবি ও তাঁদের গুণগ্রাহীরা মহাকবির ঈর্ষাপ্রসূত উষ্মা বলে মনে করলেও, কালে কালে সেই সব কবিরা স্বভাবের সত্যধর্মে কিছুকালের জন্যেও আত্মস্থ হয়ে, কিছু সংখ্যক সার্থক কবিতায় সহজ হয়ে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞতাকে মর্যাদা দিয়েছেন। যদিও সব সৃষ্টিতে সহজ হওয়া সম্ভব ছিল না, যেহেতু তাঁদের স্বভাবধর্ম স্ব-ভাবকে বিকৃত করে করে অন্যভাবকে স্ব-ভাব বলে চালিয়ে নেওয়ার দীর্ঘ অনুশীলনে অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

অতঃপর তিরিশ পরবর্তীদের কথায় আসা যাক। তিরিশের কবিদলের একজন মুখপাত্র কিছুদিন আগে স্ব-অভিজ্ঞতাপ্রসূত এমন একটি কথা লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে যার ভাব হল এই যে—রবীন্দ্রনাথকে ভয় পাবার আর কোন কারণ

কলকাতার

নেই। সে প্রয়োজন নিঃশেষিত। এখন তিনি বাঙালী নবীন কবিদের সম্মুখে আর বাধা নন, বরং তাঁকে সহায় করে পথ চলাই শ্রেয়। কথাগুলো প্রণিধান-যোগ্য। অর্থাৎ ক্যাক্‌টাসের চাষ আর নয়, এইবেলা কিছু ফুল ফুটুক। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। অথচ একথা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ চাল্লশের একজন তরুণ কবি তাঁর কাব্যিক সততায়, তৎপরবর্তী একজন মৃত-কিশোর কবি তাঁর নির্ভেজাল আন্তরিকতায় কবিতা পাঠে অনিচ্ছুক পাঠক মহলেও তীব্র আলোড়ন তুলতে পেরেছিলেন। যদিও এই দুজনের পেছনে কোন রাজনৈতিক পার্টির প্রচার তাঁদের সাফল্যে বহুতর সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, তবুও নির্দ্বিধায় বলছি—তাঁদের ব্যক্তব্যের আন্তরিকতা তাঁদের কবিতাকে সহজ সজীবতায় সমৃদ্ধ করেছে। এবং একথা সত্য যে অবয়বের চারুতা বা জটিলতা কবিতা নয়, অবযবের অন্তর্লীন ভাবের সমৃদ্ধ সজীবতাই কবিতার প্রাণ; তাত্ত্বিকদের বহুতর খেয়োখেয়ি সত্বেও একথা স্বীকারে আমি অকুণ্ঠ। রাজনৈতিক পার্টির বাঁশবাজি খেলার নায়ক না হলেও এঁদের আন্তরিকতা উন্নাসিক কবিদলের বিরুদ্ধতা ও বিতৃষ্ণা সত্বেও অভিনন্দিত হতই।

পঞ্চাশের কবিদলের কাছে আমার এই বক্তব্য আমি জানি অর্থহীন। যেহেতু ভাবের ঘরে সিঁদ কাটতে কাটতে তাঁদের স্বভাবেও সুকৃতির চাইতে বিকৃতি মুখ্য স্থান দখল করে নিয়েছে। চমকে চটকে দুর্বোধ্যতায় এবং উদ্ভট শব্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে তাঁরাও নিবিকার। যদি তা না হয় তাহলে নাম মুছে দিলে স্বতন্ত্র কবিসত্তাকে স্পষ্ট চেনা যায় না কেন? কেন মনে হয় অর্থহীন একঘেয়ে বাগাড়ম্বর? প্রেমের সেই মামুলি পুনরাবৃত্তি? তিরিশের সেই খণ্ড কবিদের প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত পঞ্চাশের কবিদের উচিত ছিল তিরিশের কবিদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা। তার জন্যে যদি রবীন্দ্রনাথকেও সহায় করতে হয়, তবুও স্বীকার; আরও পিছিয়ে যদি শুরু করা দরকার মনে হয় নির্দ্বিধায় তাই করা উচিত। অন্যথা তিরিশের কবিদের অনুকরণে ভঙ্গি প্রাধান্যই বাড়বে, মহৎ কবিতার সৃষ্টি হবে না; এবং সহৃদয় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার কারণ হবে। প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখযোগ্য যে, যাঁরা গর্ব করে বলেন 'রবীন্দ্রনাথকেও স্ব-কালের পাঠক বোঝেননি'—এমনতর স্পর্ধার প্রকাশ অশোভন; যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তিরিশের কবিদের চাইতে ঢের ঢের মহৎ, এবং পঞ্চাশের কবিদল তিরিশের খণ্ড কবিদের ভাবনায় ভঙ্গিতে ভীষণভাবে প্রভাবিত।

একথা ভুললে উদ্ভট সৃষ্টির পেছনে শক্তির অপচয় হবে মাত্র, প্রতিভার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না।

আসল কথা হল শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ। স্বভাবধর্ম অস্বীকৃত হলে বিকৃতির পথ সুগম হয়। অথচ প্রকাশের আন্তরিকতায় কবিত্বের স্ফূর্তি। স্বভাবধর্ম বিপর্যস্ত হলে আন্তরিকতা ব্যাহত হয়, তখন ফুলঝুরিকে সত্য, স্বপ্নকে বাস্তব বলে ভুল হয়। এ পথ মারাত্মক। যদিও আমি বিশ্বাস করি কালে কালে সমস্তই শোধরাবে। এবং একথা সত্য যে গর্ব করে কবিরা যতই বলুক না কেন, 'আমার নিজের আনন্দের জন্যে লেখা', তবু পাঠকের প্রশংসার মুখাপেক্ষী হওয়া যেহেতু শিল্পী মাত্রেরই স্বভাব, সেহেতু গোষ্ঠী প্ররোচনায় কোন কবিই আত্মহত্যায় রাজি হবেন বলে মনে করিনে। তাই বিশ্বাস করি সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশের ইচ্ছায় এবং তাকে গ্রন্থে সংকলিত করার উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হওয়া মানেই হাটের ভিড়ে নিজের ক্ষমতা ও কবিত্বের শক্তিকে যাচাই করা। সেখানে পাঠকের অনীহা কবিকে ভাবিত করবে, অপ্রশংসা আত্মদোষ সংশোধনের সহায়ক হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কাছেও অনুরোধ, হাল ছেড়ে দিলেই নৌকো ডুববে; তাতে বিপুল ক্ষতি।

অবশ্য পাঠকদের সহযোগিতার মনোভাব এখন অনেকটা স্পষ্ট। আধুনিক কবিদের কবিতার বই নিত্য-নিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে, প্রবীণদের সংস্করণ হচ্ছে পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে পুরোন বইয়ের, এতেই পাঠকদের উৎসাহ আন্দাজ করতে পারি। তরুণ কবিদের কবিতার বই সম্বন্ধেও আগ্রহ দিনে দিনে বাড়ছে, সে বাড়া যদিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মূল কথা হল, সহৃদয় পাঠকের সংখ্যা বাড়াতে হলে কবিদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন অনিবার্য। পাঠককে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হয় স্ব-রীতিতে, অর্থ ধরিয়ে দিতে হয় দিনে দিনে। শুধু কবিতা লেখা নয়, পাঠক তৈরিও যে সঙ্গে সঙ্গে কবির অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য, এটা কবিদের মনে রাখা উচিত।

উপসংহারে আবার বলছি, স্ব-ধর্মে অনাস্থা আন্তরিকতাকে খর্ব করে। অবশ্য 'পরধর্ম ভয়াবহ' এ সত্য উপলব্ধির জন্যে সময়ের প্রয়োজন। আর এই সময়ই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করবে মননকে। এবং তাঁদের সত্য-বোধ যেদিন নির্দ্বিধ আন্তরিকতায় ঝলসে উঠবে, মনের আকুতিতে আবেগে যন্ত্রণায় প্রকাশ স্বাভাবিক হবে, সেদিন সহৃদয়ের সংখ্যা স্বল্প হবে না একথা হলপ

করেই বলা যায়। আপাততঃ কাব্যরসিক এবং অরসিক উভয়ের কাছেই নিবেদন, কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ না করুন ক্ষতি নেই, দোকানের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে শুধু উল্টে-পাল্টে নেড়েচেড়ে দেখুন। এবং মহৎ কবিদের কাব্য-পাঠের পাঠ নিন। তাতে আর্থিক উন্নতি হবে না ; কিন্তু আত্মিক উন্নতি অবধারিত।

বরং বলি, খাওয়া পরাই মানুষের সব নয়। যথার্থ মানুষ হবার জন্যে রসের দীক্ষা নিতে হয়। কাব্য হচ্ছে সে-ই অমৃত রস। আমাদের যন্ত্রণা-জটিল ফাঁপা মরুভূমিতে কবিতাই একমাত্র মরুদ্যান, কিছুক্ষণের সান্ত্বনা॥

১৯৫৯

উপকরণ ও সামঞ্জস্য

প্রয়োজনের সমানুপাতিক আয়োজনই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের জীবনে প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়োজনের বিপুল প্রশ্রয় আছে। প্রয়োজনীয় উপকরণের বহুলতায় ও তার বহিরঙ্গের ঝলমলে জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত আমাদের উপকরণ সংগ্রহে ক্লান্তি নেই ; এবং সমারোহের অপরিমিতিতে, তার অবিরাম তর্জন গর্জনে শ্রুতি ও মন বিব্রত ব্যথিত বিমর্ষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইনে। যেখানে মালা বদলেই অঙ্গীকার সম্পূর্ণতা পেত, সেখানে আমাদের অষ্টাহ ব্যাপী হৈ চৈ, কদলী মাদুলি থেকে হবিষ্যি উলুধ্বনির ইলাহি ব্যবস্থা।

আয়োজনের ব্যাপারে আমাদের অল্পে সুখ নেই। অনেক না খেলে আমাদের ভোজন সম্পূর্ণ হয় না, অনেক না পেলে আমাদের চাহিদার তৃপ্তি নেই। অনেক কিছুকে জড় করতে না পারলে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয় না। কেমন এক স্তিমিত বিষণ্নতা আমাদের অন্তর-বাহির জুড়ে থাকে, ফলে ছুটোছুটি অন্তহীন। কি ঈশ্বর ভজনায়, কি অবকাশ যাপনে, উপকরণের বাড়াবাড়িতে উপলক্ষ্য আমাদের লক্ষ্যের স্থান দখল করে। এ যেন বিবাহ বাসরে বরকে ছেড়ে বরযাত্রীদের নিয়ে মেতে ওঠা। এতে কন্যাপক্ষের সৌজন্যবোধের

সমৃদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, তবে এতে ক্ষতি উভয়েরই। অর্থাৎ সৌজন্য বিনিময়ের অমিত হৈ-চৈয়েতে শুভ লগ্ন পেরিয়ে যায়। বরং বলা যাক, বাড়িকে সুচারু সৌন্দর্যে শ্রীময়ী করার জন্যে বাগানের প্রয়োজন স্বীকার্য; কিন্তু বাগান যদি বাড়িকে গ্রাস করে তাহলে গৃহ আর গৃহ থাকে না, বাগান-বাড়ি হয়ে ওঠে। বাগান-বাড়ি আর যা-ই হোক বাড়ি বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়।

আয়োজনের বাড়াবাড়িতে আমাদের সংগ্রহ ক্ষমতার প্রমাণ মেলে। কিন্তু সামঞ্জস্যহীন আয়োজনে উৎসব-স্থল হাট হয়ে দাঁড়ায়। তাতে কোলাহল যত আনন্দ তার শতাংশও নয়।

উৎসবের মূল্য পরিমিত অনাবিল আনন্দের সুষ্ঠু উপভোগে; হাটের মূল্য স্বার্থপর লেনদেনের অপরিমিত কোলাহলে। এ দুয়ের প্রাণধর্মের প্রকাশভঙ্গি মূলতই আলাদা। প্রথমের সামঞ্জস্যের মধ্যেই তার সুমিতি, দ্বিতীয়ের সামঞ্জস্য-হীনতায় তার বিকাশ। একের ঘাড়ে অন্যটাকে চাপালে সমূহ স্খলন। কুস্তিগিরদের পালোয়ানীর ক্ষেত্র তাদের আখড়া, সেখানে অমানুষিক হাতা-হাতি শোভন। কিন্তু গৃহের পরিসরে গৃহিণী বা ছেলেপুলের সঙ্গে একই অমানুষিকতা অসহ্য। সে বর্বরতা।

আমাদের জীবনে এ ধরণের বর্বরতা নিত্য-নিয়ত প্রশ্রয় পাচ্ছে। সে-প্রশ্রয় আমাদের প্রাণের বিকাশের স্বাভাবিকতাকে ব্যহত করছে পদে পদে। অর্থাৎ সামঞ্জস্যবোধের অভাবেই আমাদের মানসিকতা বিভ্রান্ত, আমাদের বোধ-বুদ্ধি বিপর্যস্ত।

প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যাওয়া আয়োজনেই আমাদের শক্তির উদ্যমের বিপুল অংশ ব্যায়িত হয়ে যায়। সংগৃহীত উপকরণকে যথাযথ বাছাই করে স্ব-ভাবের স্ব-ধর্মের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ বা ব্যবহার, যা বিকাশকে সহজ করে, প্রার্থিত স্বপ্নকে দেয় সম্ভাব্য পূর্ণতা, তার জন্যে আমাদের শক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন আমরা গোঁজামিল দিয়েই কাজ সারি। এর মাথা ওর ধড়ে, ওর ডান পা এর বাঁ পায়ে জুড়তেই আমরা নিজেদের ব্যস্ত রাখি। ফলে উপকরণের সুমিত ব্যবহারে যে শুদ্ধ-সৌন্দর্যের প্রকাশ সম্ভব হত, তার বদলে উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের সৌন্দর্য-বোধের উপরই অতিমাত্রায় হামলা সুরু করে। সেই হাতাহাতিতে আমাদের রুচি মরে, আমাদের চোখ বিপরীতকে যথার্থ ভেবে খুসি হতে চেষ্টা করে।

কলকাতার

এবং দিনে দিনে এই বৈপরিত্যজনিত বিপর্যয় আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করে, আমরা মরি।

অতি সাম্প্রতিক কালে গোঁজামিল দেয়ার মনোভাব পরিমাণে বাড়ছে। আয়োজনের নেশায় আমরা প্রযোজনের মাত্রা ভুলেছি, এবং অপ্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে আমাদের উদ্যম দিগ্‌ভ্রান্ত, আমাদের প্রাত্যহিক ব্যর্থতা সীমাহীন। আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা আজ সম্পূর্ণ ভাবেই পরমুখাপেক্ষী। তাই অন্যের বাক্যে চিন্তায গবেষণায় আমাদের অগোছাল মতের সমর্থন খুঁজি, এবং তাঁদেব যুক্তি দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার স্বপক্ষে জয়ধ্বনি দিই। অর্থাৎ আমরা স্বভাবজঃ চিন্তাক্ষমতাকে নিঃশেষে হারিয়েছি। অথচ আত্মশক্তিতে অবিচল বিশ্বাস সত্তাব বিকাশকে সহজ করে, শক্তির উদ্বোধনকে কবে ত্বরান্বিত। সব চেয়ে বড় কথা, স্ব-শক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠায স্ব-ত্ব বহুমুখী বিকাশে পল্লবিত হয়ে ওঠে। ধূলো-মুঠি-ছাইও সুবর্ণে পরিণত হয়।

আমাদের সমাজ মানসের গতি প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ধারালোচনাতেই আমায বক্তব্য স্পষ্ট হবে বলে আশা করি।

উনবিংশ শতাব্দীর যে জাগরণ ভারতীয সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল তার উপকরণের বিরাট অংশ সংগৃহীত হয়েছিল পশ্চিম থেকে। অর্থাৎ সে জাগরণ পশ্চিমী আবহাওয়ায় পুষ্ট। ভল্‌গা টেম্‌স ও রাইনের জলে গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের ধারা যে বেগবতী হয়েছিল এবং তার যে সত্যিকারের প্রয়োজন ছিল, এ সত্য আলোর মত স্পষ্ট। কিন্তু সেদিনের যাঁরা এ কাজে অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে যা সবচাইতে লক্ষ্যণীয় গুণ ছিল তা হল পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-বোধ। ফলে তাঁরা পশ্চিমকে উজাড় করে এনে ভারতবর্ষে চারিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি; স্বজাত্যাভিমানের সংকীর্ণতায় নয়, স্বজাতি-প্রীতির, তার ধর্মে দর্শনে ঐতিহ্যের প্রতি নিবিড় অনুরক্তি ও শ্রদ্ধার জন্যেই এদেশজ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, আবহাওয়ার মানসের অনুকূল উপকরণের সাহায্যে নিজেদের আত্মিক উন্নতিকে যথার্থ সম্পূর্ণতা দিতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের দুজন মুখ্য-নায়কের কথাই ধরা যাক। গান্ধি ভল্‌গার তীর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন অহিংস দর্শনের উপকরণ, রবীন্দ্রনাথ টেমসের কূল থেকে আবেগের আগুন। গান্ধীজী পশ্চিমের সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেননি, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের বুদ্ধি-

সর্বস্ব চাতুর্যকে। কেন দেননি, না দিয়ে ভুল করেছিলেন কিনা, দিলে f
ধরণের উপকার হত, সে বিচার তথাকথিত গবেষকরাই করুন। আমার দেখা:
বস্তু হল সেদিনের কুড়িয়ে আনা উপকরণের যথার্থ বাছাই করা ব্যবহারে জাতী
জীবনের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল কিনা ? এবং যা তাঁরা কুড়িয়ে এনেছিলে
তাঁদের সৃষ্টি কি সে সব উপকবণের হুবহু প্রতিলিপি, নাকি নতুন কিছু.
স্পষ্টই বলি তাঁদের দান অনুকরণ নয়, অনুসরণও নয়। স্ব-ভাবে, স্বভাব ধ
ধর্মান্তরিত করে স্বীকরণ। অর্থাৎ স্বকীয় করণ। এবং সেদিনের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে
বিস্তারিত বলা বাহুল্য।

আসল কথা হল উপকরণ নিশ্চয়ই আমবা সংগ্রহ করব, কিন্তু স্বীকরণ চাই
অর্থাৎ যথাযর্থ প্রয়োগে সামঞ্জস্য দান ও নিজত্ব আরোপে রূপান্তর। কিন্
এ কাজ কঠিন, ভীষণ দুরূহ। এই দুরূহতাকে অতিক্রম করা স্বল্প শক্তিমান
গুণীদের সাধ্য নয়, সে কাজ আত্মশক্তিতে বিপুল বিশ্বাসী প্রতিভাবানের
কারণ গাণ্ডিবে ছিলা দেযাব ক্ষমতা সবার ছিল না, সে ক্ষমতাব অধিকারী
অর্জুন ; এবং হরধনু ভঙ্গের কৃতিত্ব একমাত্র রামেব। দুঃশাসনদের জন্যে যে
ধনু, সে ধনুর ধবণই আলাদা। উৎসাহের বশে গাণ্ডিবে ছিলা দেযার অথব
হরধনু ভঙ্গের দুঃসাহস তাঁদের পক্ষে হাস্যকর স্পর্ধাব প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়
একালে এমনতর দুঃশাসনদেরই প্রচুর প্রতিপত্তি। এঁদের মনোবৃত্তির ধরণই
আলাদা। এঁরা অভিমন্যুব মত চক্রব্যূহে প্রবেশের কায়দা কানুনটুকুই জেনেছেন ;
কিন্তু কি কবে বেরতে হবে তা তাদেব অজ্ঞাত। ফলে পশ্চিম থেকে নির্বিচারে
উপকরণ সংগ্রহেব ছাড়পত্র দিয়েই চলেছেন। পশ্চিমের সব কিছুই এঁদের মতে
উপাদেয় এবং মনোহারী। অতএব আমদানিকৃত উপকরণ ভারতের মাটিতে
অজস্রভাবে ছড়িয়ে দেয়া হোক। এঁদের ধারণা তাতেই জাতীয-সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত
হবে। কিন্তু এঁরা একবারও ভেবে দেখেননি যে, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওযায়
যে-চারা গতরে বাড়ে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সে চারা আদৌ বাঁচবে কিনা ?
বাছাই-এর মহৎ দাযিত্ব সম্বন্ধে এঁদের অনেকেই মনে মনে সচেতন থাকা সত্বেও
মোহগ্রস্ত এঁরা মুখে মানেন না, ফলে নির্দেশ দিচ্ছেন—ছাঁচ পাল্টাও, ঢালাই কর
সমস্ত কিছুকে পশ্চিমী ধরণে। তাঁরা বলছেন—একালে জাতীয়তার প্রশ্ন অবান্তর,
সে সঙ্কীর্ণতা। এ যুগ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের। অতএব বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ তাঁরা
দশ হাতে পশ্চিমী ধ্যান-ধারণাকে স্বভাষায় অনুবাদ করে চলেছেন। এঁদের
কাছে এদেশের সব কিছুই, এমনকি যে পিতৃত্ব এঁদের জন্মের জন্যে দায়ী তাও

কলকাতার

তাঁদের উন্নাসিক মনোভঙ্গির বল্লমে নিত্য-নিয়ত বিদ্ধ হচ্ছে। বিচার বিবেচনা যাচাই চলেছে পশ্চিমী দৃষ্টিতে। ফলে এদেশের সব কিছুই তাঁদের চোখে নিকৃষ্ট, এত নিকৃষ্ট যে উল্লেখেও তাঁদের নিদারুণ কুণ্ঠা।

এ শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সমাজ জীবনের সর্বত্রই পশ্চিমী উপকরণের ঢালাও আমদানি সুরু হয়েছে। চটকে চমকে উদ্ভট কিছু করার উল্লাসে, নতুনত্বের মোহে সমাজের নারী পুরুষ মেতে উঠেছে। পোষাকে-পরিচ্ছদে চলনে-বলনে রঙে-ঢঙে সব কিছুতেই পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ। এ সমাজের দিকে তাকালেই মুহূর্তেই এ সত্য স্পষ্ট হবে।

এই সামঞ্জস্যহীন হৈ চৈ আত্মঘাতী। সর্বনাশের লগ্নে মানুষের শুভবুদ্ধি যখন বিপর্যস্ত হয় তখন অন্ধকারকে আলো এবং যথার্থ আলোকে মরীচিকা বলে ভুল হয়।

আমাদের প্রাচীন ঘরে, যে ঘরে বাইবের আলো হাওয়ার প্রবেশ বন্ধ করে দীর্ঘকাল আমবা হেঁটমুণ্ডে ঊর্ধ্বপদে যোগাভ্যাসের চর্চা করেছি, গত দুই শতকে সেই ঘরে আলো হাওয়ার প্রবেশকে অস্তিত্ব রক্ষার জরুরি প্রয়োজনে স্বাগত জানিয়েছিলুম। দীর্ঘদিনে আমরা দেযালগুলোর সংস্কার করে জানলাগুলোকে দরজার দৈর্ঘ দিয়েছিলুম, এবং দরজাগুলোকে সিংহদ্বারের মর্যাদা। ফলশ্রুতি এই যে তাতে আমাদের স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছিল। অবশ্য ফাঁকা পেয়ে বিশুদ্ধ হাওয়াব সঙ্গে প্রচুর ধুলো ধোঁযাও ঢুকে পড়েছিল—প্রথমতঃ অসতর্কতায়, দ্বিতীয়তঃ প্রশ্রয়ে। একালে সেই ধোঁযা-ধুলোই আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িযেছে। তবু স্বীকার করা ভাল ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও সেদিনের প্রচেষ্টার অনেকটাই সার্থক হয়েছিল। কিন্তু প্রতি যুগে একই ভাবের পুনরাবৃত্তিতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে ইতিহাস তেমন কথা বলে না; আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ত নয়ই।

পুরো দু' শতাব্দী ধবে সম্ভাব্য উপকরণ আমদানি করেও, কী আশ্চর্য, এখনও আমরা কি চিন্তায়, ভাবনায়, ধ্যানে ধারণায় স্ব-প্রতিষ্ঠিত হতে পারিনি। এখনও আমরা আমদানির হুকুমনামা দিয়ে চলেছি। তার চেয়ে আমরা কেন নিজেদের প্রয়োজনের উপযোগী কিছু চিন্তা করিনে? চিন্তা করার চেষ্টা করিনে?

যে দেহে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে প্রতি মুহূর্তে রক্তের জন্যে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে দাঁড়াতে হয়, সে দেহের অস্তিত্ব থাকার চাইতে না থাকাই শ্রেয়। ভিক্ষালব্ধ রক্তে আর যাই-ই হোক অস্তিত্ব রক্ষার বিপুল সংগ্রাম চালান যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের সংস্কৃতির সভ্যতার সবটাই কি ভিক্ষালব্ধ? যদি তা না হয় তাহলে নিজস্ব পদ্ধতিতে চিন্তা-ভাবনায় সত্যকে ছোঁয়ার চেষ্টা আমাদের পক্ষে মোটেই স্পর্ধার প্রকাশ হবে না। তাছাড়া অন্য কারণও আছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমী ভাবনা-চিন্তায় অভ্যস্থ হতে চেষ্টা করার ফলে আমাদের সামাজিক মানসিক বিশৃঙ্খলা বুদ্ধিমানদের নজরে না পড়ার কথা নয়। ইতিমধ্যেই বেহিসেবী পদচারনায় আমাদের ক্ষতির অঙ্ক সীমা ছাড়িয়ে চলেছে, এবং আমরা দিনে দিনে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠছি। বিশ্বাস হারিয়েছি, মূল্যবোধে এসেছে বিরাট পরিবর্তন, চারদিকে ভাঙছে শুধু ভাঙছে; এবং আমাদের মানসিক প্রবণতা আত্মহত্যার দিকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকছে। এর সবটাই অর্থনৈতিক বৈষম্য জনিত সংকট নয়, এর অনেকটাই আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ও পরধর্মে নিষ্ঠাজাত ভয়াবহ বিকৃতি।

অতএব স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সচেতন সাধু উদ্যমেরই আশু প্রয়োজন। এমনতর সংকট-মুহূর্তে আমাদের দ্বিধা সমূহ সর্বনাশের কারণ হবে। তাতে শ্যাম কুল দুই-ই যাবে। এমন কি আমাদের পশ্চিমী-গৌরাঙ্গ প্রেমে গদগদ অস্তিত্বও রক্ষা পাবে না। অর্থাৎ অস্ত যাবে।

১৯৭৯

আমাদেব আশে-পাশের ছড়ান প্রকৃতির রহস্য বিচিত্র। নিত্য উৎসারিত তার অন্তরের বিস্ময় অন্তহীন। মানুষের বুদ্ধি, তাব প্রজ্ঞা গুহায়িত সেই অপরিমিত রহস্যেব শেষ আবিষ্কারে দীর্ঘদিন থেকে ব্যস্ত। আজও সেই বিস্ময়ের অনেকটাই অ-ধবা। কোন দিন সে সম্পূর্ণভাবে ধবা দেবে কিনা জানিনে, যদি দেয় সেদিন চরমতম সিদ্ধিব বিস্ময় এবং পুলক মানুষের ইতিহাসকে সমৃদ্ধির চূড়ান্ত সম্মানে ভূষিত কববে সন্দেহ নেই। সেদিন মানুষ হবে সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরত্বেব গৌরব ত্বরান্বিত হোক এ কামনা সবারই, কিন্তু বাধা অন্যত্র।

আমবা যাবা একালেব পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে গতকালের ইতিহাসকে শ্রুতি ও স্মৃতিব মাধ্যমে অনুধাবন করার চেষ্টা করছি, এবং দূবদর্শীদের দূরবীণে ভবিষ্যতকে অনুমান কবাব কষ্ট মেনে নিচ্ছি, তাদের কাছে সাময়িক প্রশ্ন বিপুল আকার নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তাতেই এত বিব্রত ব্যথিত ও বিভ্রান্ত যে ভবিষ্যতের সুবর্ণকান্তি দিনের আশায় বুঁদ হবাব স্বপ্ন আমাদেব ঘুচে গেছে; প্রাত্যহিক স্বপ্নভঙ্গে ব্যর্থতায় আমরা নিরতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত এবং এ মুহূর্তেব বাঁচাব প্রশ্নে সবিশেষ উৎকণ্ঠিত। আমাদেব অবস্থা অনেকটা 'প্রাণে বাঁচলে বাপের নাম' গোছেব। অর্থাৎ এ মুহূর্তে বাঁচলেই অতীত অনতীতেব চিন্তা; নয়ত নয়।

আজকের যে সত্যজ্ঞান আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী কবে তোলে সে জ্ঞান খণ্ডিত। খণ্ডিত সত্যে বিধৃত যে জ্ঞান, সে জ্ঞানেব উপব ভরসা করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা অনেকেব পক্ষেই অসম্ভব; যেহেতু মানুষ তার লক্ষ্য সম্বন্ধে, এবং লক্ষ্যভেদে সিদ্ধ হলে সম্ভাব্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অগ্রসর হতে উৎসুক। অনির্দিষ্টতা ও অনিশ্চযতা মানুষেব চলাকে ব্যাহত করে। অথচ অখণ্ড সত্যজ্ঞান মানুষেব এখনও অনায়ত্ত। যাঁরা জোবের সঙ্গে বলেন, সে সত্য আচ্ছন্ন, আবরণ উন্মোচনেই তাকে স্পষ্ট কবা যাবে; আমার মনে হয় তাঁরা যথার্থ বলেন না। হয় বিশুদ্ধ সত্যে তাঁরা অবিশ্বাসী, নয়ত অনন্ত

ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বরং এভাবে বলা যায়—আচ্ছন্ন বলেই সে অ-ধরা তা নয়, নিতল গভীর বলেই সে অস্পষ্ট। আচ্ছন্ন একটি আবরণে হতে পারে, বহু আবরণেও হতে পারে। কিন্তু যা নিতল গভীর তার বিস্তৃতি সীমাহীন, এবং তার সবটাই গম্য নয়, তার অনেকটাই দুরধিগম্য। দুর্গম যা তাকে বিষয়ী বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে স্পর্শ করা অসম্ভব। কারণ বিষয়ী বুদ্ধির উল্লম্ফনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই চরম ও পরম জ্ঞান লাভেব জন্যে প্রযোজন প্রত্যয়ের। এ প্রত্যয় ঈশ্বরে বা ধর্মে প্রত্যয় নয়, বৃহৎ কোন শক্তিকে স্বীকার করাও নয়—এ প্রত্যয় মানুষেব ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেবার। স্ব-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলেই মানুষ উপলব্ধি করবে এ বৃহৎ বিশ্বলীলায় তার ভূমিকা কত নগণ্য। এবং এই সচেতনতা তাকে সংযত হতে সাহায্য করবে, তাব উর্ধ্বশ্বাস ছোটাকে যতির বিরাম দিয়ে ছন্দের ললিত বিন্যাসে করবে সুন্দর।

একলাফে শতযোজন পেরবার ক্ষমতা মানুষের নেই। সে পারে না। মানুষের শক্তিতে বিপুল বিশ্বাসী ও এমনতর স্পর্ধা মুখে নয়, যতদূর সম্ভব মনে মনেও পোষণ করেন না। যাঁবা করেন তাঁরা আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ মানুষেব ভাবনা চিন্তার বাইরের। তাঁরা অ-মানুষ। তাঁরা নমস্য।

আমবা যারা সাবাক্ষণ কল্পনার আকাশে উড়তে অনভ্যস্ত, যারা উচ্চকোটিব অতি-প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের কাছে অপাংক্তেয় এবং মনুষ্যপদে অবাচ্য, আমবা স্বীকার করছি আমবা দুর্বল। তত্ত্বের হাড়িকাঠে গলা দিয়ে অমৃতেব পুত্র হওয়ার চাইতে ছয় রিপুব তাড়নায় বিব্রত-হওয়া স্বাভাবিক মানুষ হতেই আমাদেব আকাঙ্ক্ষা সমধিক। তাই সমস্যা-জটিল এ সংসারে এ মুহূর্তের বাঁচার প্রশ্নে আমরা অতিমাত্রায ব্যস্ত। ভবিষ্যতের মহৎ স্বর্গ প্রাপ্তির লোভে সাময়িক প্রশ্নকে তাই এড়িয়ে যেতে আমরা কিছুতেই পারিনে। কালের অসহ অস্থিবতা আমাদের পাযের নীচের মাটি ধরে টান দিয়েছে, তাতে আমাদের ধ্যান-ধারণা নীতি-ধর্ম সম্পর্ক-প্রত্যয় বোধ-বুদ্ধি এক অতিকুটিল সবনাশা পথে পা বাড়িয়েছে; এবং জীবন ও জগতের প্রশ্নে অন্তহীন অনিশ্চযতা সুস্থ জীবনযাত্রার সম্ভাব্য স্বস্তিকে নিত্য-নিয়ত দূরে ঠেলে দিচ্ছে, ক্রমবর্ধমান বিকৃতি নষ্ট করছে আমাদের সুকৃতির আপাতসুস্থ ধারণা। অথচ বাঁচার পক্ষে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা, সুস্থ মূল্যবোধ ও প্রত্যয়ের সুস্থির ধারণা অত্যন্ত

কলকাতার

প্রয়োজনীয় উপকরণ। এ ছাড়া মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। জীবনের যখন সমস্তই এলোমেলো হতে বসেছে তখন টীকাভাষ্যে অবোধ্য তত্ত্বকথার গরু তাড়ান রাখালী করার মত অবকাশ কোথায় ?

সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবার জন্যে ব্যায়ামের প্রয়োজন স্বীকার করি ; কিন্তু উপোসী মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী খাদ্যের। খেয়ে বাঁচলেই স্বাস্থ্য রক্ষা. অন্যথা মৃত্যু। তাই আশু প্রয়োজন খাদ্যের, ব্যায়ামের নয়। ব্যাযামের প্রশ্ন পরবর্তী। এবং সে ব্যায়াম বদ্ধ ঘরে তত্ত্বের ভারি যন্ত্র-সহযোগে নয়, মুক্ত আকাশের নিচে সত্যকে সম্বল করে খালি হাতে।

আমাদের সমাজের, সমাজ মানুষের সাম্প্রতিক অবস্থা ক্ষুধার্তের। এখন প্রয়োজন বর্তমান মুহূর্তে বাঁচার উপযোগী উপকরণের। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অনাগতের প্রশ্নে ব্যথিত হবার মত যোগ্য উত্তরাধি-কারীর অভাব ঘটবে একথা উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে সব সময়ে থাকে না। ফলে দার্শনিক প্রশ্নে তাঁরা যত বিব্রত, সাময়িক প্রশ্নে তত নন। তাঁদের কথা হল, 'যা হচ্ছে হতে দাও, অবশেষে একটি লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌছবে। আমরা ততক্ষণে অনাগত সমস্যার সমাধান মানসে ধান ও মাসকলাই-এর গুণগত তাৎপর্য, গাধা এবং ঘোড়ার প্রয়োজনগত মূল্যমান এবং দূর অতীতে মানুষ-মানুষীকে কাপড় পরিয়ে যে সবগ্রাসী জটিলতা ও সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সংকট সমাধানে তাদের সচেতনভাবে নগ্ন করার ব্যবস্থাপত্র দিযে চূড়ান্ত সভ্য এক মানব সমাজকে ত্বরান্বিত করি।'

যুক্তিসর্বস্ব বুদ্ধি যে কত সর্বনাশা একালের বুদ্ধিজীবীদের খেয়োখেয়িতেই সে সত্য স্পষ্ট। পরস্পর বিরোধী যুক্তির দাবাখেলার রাজামন্ত্রীর লড়াইয়ে চিরকালের উলুখাগড়া বোড়ের দলের সমূহ সর্বনাশ হচ্ছে। কারণ, ক্রমবর্ধমান বুদ্ধি-নির্ভর চিন্তা দিনে দিনে জটিলতা বাড়াচ্ছে, সহজকে করছে ঘোরাল, স্বচ্ছকে করছে অস্পষ্ট। যা ছিল স্পর্শযোগ্য তাকে ভাষার কারিকুরিতে, উটকো চিন্তার মোহভাষ্যে নাগালের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। এঁরা হচ্ছে একালের সেই জীবিত ঠাকুরের মতো যিনি কবিতা নামধেয় এক ধরণের দাঁতভাঙ্গা শব্দের অর্থহীন আড়ম্বরে আচ্ছন্ন করে প্রাত্যহিক পানাহার সম্বন্ধে স্বল্পতম জ্ঞান দান করেন। ফলে ব্যবহারিক জ্ঞানও এ সমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতদের হাতে পড়ে ব্যবহারের

অযোগ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য এঁদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নৃত্যের মুদ্রাসমন্বয়ে সৃষ্ট বিশ্বজনীন খিচুড়ি নাচ যে সাধারণের চোখে সর্ষেফুলের বিমূঢ় বিস্ময় নিয়ে চমকে দিচ্ছে, দিতে পারছে, এ সত্য স্বীকার্য।

কিন্তু চমক সত্য নয়। আলেয়া আলো নয়। যেহেতু আমাদের অন্ধকার ঘরে আলোর প্রয়োজন জরুরি, যখন আলোই আমাদের প্রার্থনা, তখন তথাকথিত পণ্ডিতদের আলেয়ার ছোঁয়াচ আমাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। নইলে বড় বড় পরিভাষার ইঁটে আমাদের মা' ' ফাটবে, এবং তাঁদের বড় কথার চকমকিতে ধ াধান-চোখ আমরা আত্মবিশ্বাস হা রিয়ে অতলে ডুবব।

আগেই বলেছি প্রত্যয় ঈশ্বরমুখী অথবা বৃহৎ কোন শক্তি নির্ভর হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রাত্যহিক বাঁচার পক্ষে যে-প্রত্যয় অত্যন্ত জরুরি যে-প্রত্যয়ের অভাবে চলা থেমে যায়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সে প্রত্যয় সচেতন হতে হবে। সে-প্রত্যয় মানুষের স্ব-শক্তি সম্পর্কে প্রত্যয়। স্ব-শক্তি সম্বন্ধে বড় ধারণা থাকা ভাল, কারণ বড় আশা শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু সে ধারণা যদি অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয় তাহলে সমূহ অকল্যাণ। একালের মানুষের মানুষের শক্তির প্রতি বিশ্বাস অনেকটা মধ্যযুগীয় অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ। মধ্যযুগীয় অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। তার প্রমাণ একালের মানুষের যান্ত্রিক ধর্মাচরণ ও নাস্তিকতা প্রীতি। সেকালে ধর্মের উপর সবকিছুই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, ফলে ধর্মধ্বজরা ইচ্ছেমত ঈশ্বর ভাষ্য করেছে। তাতে একদল মত্ত হয়েছে অনুষ্ঠানে, মনে করেছে অনুষ্ঠানেই ভগবান; অন্যদল ছিটকে তফাতে সরে গেছে, বলেছে ভগবান নেই। একালে এই বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে, এবং নির্ভরশীল হয়েছে বিজ্ঞানে। তাতেও সংকট কাটেনি।

মধ্যযুগীয় ধর্ম-বিশ্বাসে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান মানুষের হাত ধরল। গত প্রায় তিন শতাব্দী ধরে মানুষ বিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়েছে। মধ্যযুগে মানুষ ধর্ম-নির্ভর ছিল, পরবর্তী যুগে বিজ্ঞান-নির্ভর। যখনই আমরা যার উপরে নির্ভর করেছি তখনই তার হাতে আমাদের সমস্ত ছেড়ে দিয়েছি। অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার ফলে ধর্ম আমাদের ব্রত-নিয়মের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে ঠকিয়েছে, বিজ্ঞান অনেক পাওয়ার আশ্বাস দিয়ে আমাদের যন্ত্রণাকে সহস্রমুখী করে তুলেছে। অথচ এদের কারও হাতেই আমাদের মহৎ-মুক্তির অভিজ্ঞান নেই

একথা সবে আমবা জানতে সুরু করেছি, আর ইতিমধ্যেই আমাদের অস্তিত্বেব গোড়ায় টান পড়েছে, এবং পায়ের নিচেব মাটি দ্রুত সংতে সুরু করেছে। অবশ্যই দোষ ধর্ম অথবা বিজ্ঞানেব নয়, দোষ প্রয়োগকর্তাদেব। এবং এই প্রযোগকর্তারা মানুষ। মানুষেব উদ্ভাবনী ক্ষমতাব অহংকাব মানুষকে টেনে নামিয়েছে। ফলে দু দিনেব জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্দিন। এ দুর্দিনকে সুদিন কবাব দায়িত্ব মানুষেব।

সবাব উপবে মানুষ নিশ্চযই সত্য, যেহেতু তাব উপবে কে আছে আমবা যখন জানিনে তখন উপবেব কথা উহ্য থাক। সমস্ত প্রাণীর উপবে যে মানুষ সে এই সংকট-মুহূর্তে তার স্ব-শক্তি সম্বন্ধে গভীর প্রত্যয়ে সচেতন হোক। এতে শক্তিব অপ প্রযোগ বন্ধ হবে, যথার্থ ব্যবহাবে পূর্ণতা হবে ত্বরান্বিত। অন্যথা বীর্যহীনতায, দুর্বলতায, মানুষেব ইতিহাস সর্বগ্রাসী সর্বনাশের নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় চিবদিনের মত নিশ্চিহ্ন হযে যাবে। কাবণ বেঁচে থাকা মানে প্রায় মৃতদেব জন্যে শ্মশান জাগিযে বাখা নয়। অথচ একালেব আমবা শ্মশান জাগিযে বাখা ছাড়া কী-ই বা কবছি।

শিবা আব সাবমেয চিৎকাব আমাদেব সিংহদ্বাবেব কড়া নাড়ছে। এ মুহূর্তেই ভেবে দেখুন—কিভাবে এগোবেন? মানুষের ক্ষমতাব সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিযে ধীবে, নাকি অফুবন্ত শক্তির অধিকাবী হিসেবে দ্রুত?

১৯৫৯

যথার্থ সৌন্দর্য প্রসাধন-নির্ভর নয়, যদিও প্রসাধন-প্রিয়তা তথাকথিত নারীর এবং শিল্পীর স্বভাব-ধর্ম। তাই অভিজ্ঞা রমণী দক্ষতার সঙ্গে প্রসাধনের শেষ চিহ্নটুকুও উহ্য রাখায় সচেষ্ট, যাতে মনে হবে শ্রীমতীর সমস্ত শ্রী-ই বুঝি বা প্রকৃতিদত্ত; এবং তথাকথিত শিল্পী সতর্ক কুশলতায় প্রযত্নের সামান্যতম ছাপও আড়াল করার চেষ্টা করে যাতে ভ্রম হয়, স্বতঃস্ফূর্তির সবটাই হয়ত বা শিল্পের স্বভাবের। সূর্যের আলোর মতই এরা আপন অস্তিত্বের সাত-সাতটি রঙকে উহ্য রেখে শুধুমাত্র রৌদ্রের রঙটুকুকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের কাছে স্পষ্ট করতে প্রাণপাত করে। কিন্তু মহৎ শিল্প-সৃষ্টিতে এই সচেতন কারুকর্মের কৃতিত্ব খুবই স্বল্প। কারণ সৎ-শিল্পের ভগ্নাংশই প্রযাসলভ্য। শুধুমাত্র সচেতন প্রযাসের দ্বারা মহৎ শিল্প-সৃষ্টি অসম্ভব। যতই প্রসাধন-কুশলা হোক না কেন, যদি দেহে লাবণ্যের অভাব ঘটে তা হলে অতি বড় দক্ষতাও ব্যর্থ হয়, স্বতঃস্ফূর্তির অনটন সহজেই ধরা পড়ে।

একালের অনেক শিল্পীই লাবণ্যের অভাবকে প্রসাধন নিপুণতায় ভরিয়ে তুলতে চান। তাঁরা যে যথার্থ শিল্পী নন তার প্রমাণ তাদের বারহাতী কাপড়েও শিল্পের অস্তিত্বের খুঁত ঢাকা পড়ে না। মনে হয় তাঁদের শিল্পসৃষ্টি যেন শো-কেসে সাজান মূর্তি, যেগুলোর অস্তিত্বে প্রাণের ভান আছে, প্রাণ নয়। অথচ শিল্প ভান নয়, ছলনা নয়,—সাক্ষাৎ জীবন। তার নাড়ীতে আছে প্রাণের স্পন্দন, ধমনীতে উষ্ণ রক্তের অস্তিত্ব। জীবনের হুবহু অনুকরণ না করেও সে জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী। বরং বলা যায় জীবনের চেয়েও জীবন্ত, এবং সুন্দর।

খাল কাটলেই খালে জোয়ার-ভাটা খেলে না, তার জন্যে নদীর মাধ্যমে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই—যে সমুদ্রে সূর্য-চন্দ্রের আকর্ষণে বিকর্ষণে ভরা-কোটালের মরা-কোটালের সৃষ্টি হয়। সৎশিল্পসৃষ্টির জন্যেও সেই সমুদ্র সান্নিধ্য অত্যাবশ্যক। এবং শিল্পের সেই সমুদ্র বাইরে নয়, অস্তিত্বের

গভীরতম প্রদেশে, অর্থাৎ অন্তরে—যেখানে ভাবের তর্জনে-গর্জনে, আকাঙ্ক্ষার হুটোপুটি লুটোপুটিতে পুঞ্জ পুঞ্জ আবেগের ঢেউ লাফিয়ে ডিঙিয়ে সত্যের বহু বিচিত্রবর্ণে দ্যুতিময় বিশাল আকাশকে ছোঁয়ার অবিরাম স্পর্ধায় মাথা কুটছে। সেখানে কখনও দিগন্তগ্রাসী তুমুল কোলাহল, কখনও নিঃসাড় নিঃসীম নির্জনতা। সেই শব্দময় শব্দহীন, সেই আলোয়-অন্ধকারে জড়াজড়ি করা বিসারিত জগতে কত সহস্র গ্রহ-উপগ্রহের বিরামহীন পরিক্রমা, কত আকস্মিক বিপর্যয়জনিত সংঘাত। সে যেন এক সমুদ্রগর্ভ স্বতোৎসারিত তুবড়ি, যার সহস্র ধারা-মুখে অন্তহীন হীরে মণি মাণিক্যের জ্বালাময়ী আলো ক্ষণদীপ্তিতে দিক-বিদিক আলোকিত করে নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে। সৎ-শিল্পী এই বিচিত্র বর্ণে অপরূপ অন্তরের দাসানুদাস। অন্তরের অস্তিত্ব তার কাছে অনেকটা শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের মতই অনন্য সত্য। এ বিনে বৃন্দাবন অন্ধকার, এ বিনে মন্দির শূন্য। আন্তর-ঐশ্বর্যে দরিদ্র যে তাঁর শিল্পকর্ম মিথ্যে, সে শিল্পী শিল্পী নয়। সে তখন কৃষ্ণহীন রাধিকার মতো, হয় তাঁর মূর্ছা কিছুতেই ভাঙবে না, নয়ত সে প্রমত্ত।

একালে এ ধরণের প্রমত্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মমতার যে ওমে আপন সৃষ্টি দিনে দিনে গর্ভস্থিত ভ্রূণের মত আকার প্রাপ্ত হয়, যে মমতার সৎ-স্পর্শে লক্ষ লণ্ঠনের আলো ঝলমল শিল্পগুহার রুদ্ধ সিংহদ্বার পলকে উন্মুক্ত হয়ে যায়, এঁরা সে ঐশ্বর্যে দরিদ্র; ফলে বুদ্ধির সিঁদকাঠি দিয়ে এঁরা পেছনের দরজার হদিশ পাবার জন্যে এলোমেলো ঘা দিয়ে দিয়ে পথ খোঁজার একক চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যূথবদ্ধ হয়। তারপর পরস্পর পরস্পরের ঢাকে কাঠি পিটে প্রমাণ করে যে, তাঁদের পথই যথার্থ পথ।

অক্ষমেরাও যখন সক্ষমের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, যখন মানুষের দুর্বলতম স্থানে ঘা দিতে থাকে, অর্থাৎ মানুষের দীনতা হীনতাকে মহত্ত্বের পোষাক পরিয়ে নিরন্তর সুড়সুড়ি দিতে সুরু করে, তখন স্বাভাবিক কারণে সাময়িক ভিড় বাড়ে, দল সংখ্যায় ভারি হয়। তখন তাঁদের আঘাত করতে সক্ষমও ভয় পায়, কারণ প্রমত্তদের কাছে সত্যের মূল্য কানাকড়ি। না, তা নয়, সক্ষম চুপচাপ থাকতে বাধ্য হয়, নইলে প্রমত্তদের অসংগত প্রলাপে বহুকষ্টে অর্জিত তন্ময়তার স্বস্তি হারানর সমূহ সম্ভাবনা।

'শিল্পের রাজ্য সচেতন বুদ্ধির ফসল'—প্রমত্তদের এইই আপাততঃ শেষ আবিষ্কার। এ আবিষ্কার অন্তিম আবিষ্কার নয় বলেই, এঁদের সম্বন্ধে পারত-

পক্ষে মুক থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একেবারে অচেতন হলে মহৎ ক্ষতি এড়ান কিছুতেই সম্ভব হবে না। কারণ এঁদের কালাপাহাড়ি মনোবৃত্তি শুধু সত্যকে নিয়ে ভানুমতীব খেলা দেখাচ্ছে তা নয়, মানুষের মনোবৃত্তিব সুস্থতাব বঙ পাল্টিযে নতুন বঙ কবে ছেড়ে দিচ্ছে। এদেব বিশ্লেষণেব নামে বিকাবী অসুস্থতা, পাণ্ডিত্যেব নামে শোভন উদ্ধৃতি ও মহৎ নামেব নির্ঘণ্ট দেবাব মূঢ়তা—সব চেয়ে বড় কথা, এদেব হিজমাস্টাব ভয়েসি এক ঘেয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় একই বেকর্ডেব সংখ্যাহীন পুনরাবৃত্তি সাধারণ মানুষেব চোখে ধুলো দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্যই এঁদেব হাত থেকে শিল্পকে মুক্ত কবাব পথ উচ্চকণ্ঠ বিতর্ক নয়, পথ আপন স্বভাবেব গূঢ় প্রেমে তন্ময় হয়ে আত্মবিশ্বাসে এবং সুদৃঢ় নিষ্ঠায় স্ব-ভাবেব স্ব-ধর্মেব অবিবাম শুদ্ধ অনুশীলন। কাবণ অনুভব যদি স্ব-ভাবেব সৎ পণ্য হয়, সাধনায় যদি সত্য থাকে এবং প্রকাশেব যন্ত্রণা যদি যথার্থই আন্তবিক হয়, তা হলে প্রতিপক্ষেব চোখ ঝলসান চমকেব বহুলতা সত্ত্বেও চবম শিল্প-সিদ্ধি কিছুতেই হাতছাড়া হতে পাবে না। অর্থাৎ সৎ-শিল্পী হবাব জন্যে প্রাথমিক প্রযোজন স্বভাবেব প্রতি সততাব।

অতঃপব স্পষ্ট কবি শিল্পেব শবীবেব লাবণ্যেব, যাব অভাবে শিল্প অ-শুদ্ধ, বেগহীন এবং নিস্প্রাণ।

ফুলেব শবীবেব লাবণ্য জ্ঞান, ব্যবচ্ছেদ লভ্য নয়। চিবে চিবে সে লাবণ্যকে ছোঁয়া যায না। এ যেন ঠিক সেই পবমতম চবমতম সত্য যাকে যুক্তি দিযে বুদ্ধি দিযে ছুঁতে পাবিনে, অথচ মনে প্রাণে যে সত্যেব অস্তিত্বকে নিরন্তব অনুভব কবি। অর্থাৎ স্পর্শাতীত এ সত্যকে অনুভবে নিশ্চিতরূপে হাঁ বলে মানি। শিল্পেব শবীবেব লাবণ্যও ঠিক তাই, যাব আলোয আমাদেব গভীবতম সত্তা আলোকিত এবং পুলকিত হয, যাব সান্নিধ্যে আমবা অশেষ সুখ এবং সুখস্পর্শে আমবা ক্ষণ উত্তবণেব স্বস্তি অনুভব কবি। ববং বলা যায এই লাবণ্য হল নবীনত্বজাত সেই সতেজ ও সজীব সত্তা যাব মৃদুস্পর্শে কুৎসিততম বস্তুও মুহূর্তে দৃষ্টি-সুন্দব হযে ওঠে, কুকুবীও ধন্যা হয। একেই কি আমবা যৌবন বলি? যদি যৌবনেব অর্থ এত গূঢ় এবং বিস্তৃত হয তা হলেই প্রশ্ন কবা যেতে পারে, শিল্পেব শবীবে এই যৌবনচিহ্ন কিভাবে প্রকাশ পায়, অথবা জন্ম নেয়?

আগেই বলেছি যথার্থ সৌন্দর্য প্রসাধননির্ভব নয, এবং সৌন্দর্যেব উৎস যে-

লাবণ্য সে-লাবণ্য স্পর্শের অতীত কিছু, অথচ সে কিছুর অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে সত্য। এবং বলা বাহুল্য সে-লাবণ্য বুদ্ধিজাত নয়।

গত দিনের সমস্ত মহৎ শিল্পীর কাছেই অন্তঃপ্রেরণার অস্তিত্ব স্বীকৃত। তাঁরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন যে তাঁদের মৌলিক এবং মহৎ শিল্পকর্মমাত্রেরই জন্ম সচেতন বুদ্ধির অতীত এক উৎস থেকে। যার জন্যে তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন—'আমার সমস্ত বিখ্যাত গান আমাকে সৃষ্টি করেছে, আমি গান সৃষ্টি করিনি'। কখনও বলেছেন—'আমার বিখ্যাত সৃষ্টিসমূহের স্রষ্টা আমি নই, সে অন্য একজন'। কেউ বলেছেন—'সে জীবন-দেবতা'; আবার কেউ বলেছেন—'সে এক উপকারী শক্তি। অলৌকিক কিছু।' একজন ত স্পষ্টই জানিয়েছেন—'সে অন্য এক যে তাঁর আপন পছন্দ মতো গড়ে চলেছেন। সে সব ভাল কি মন্দ আমি যখন ভাবতে চেষ্টা করেছি তখন আমি ভয় পেয়ে নিজেকে বুঝিয়েছি, আমি কিছু নয়, কিছু নয়।' এবং অন্য একজন নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে—'লিখবার পূর্বেও আমি জানতুম না আমি কি লিখতে চলেছি। যখন লিখতে সুরু করলুম তখন দেখলুম আমি যা লিখেছি তার কিছুই আমি কোন কালে জানতুম না'। এজন্যেই হয়ত একজন মহৎ কবি স্পষ্ট ঘোষণা করার সাহস পেয়েছিলেন যে—'একটি লোক কিছুতেই বলতে পারে না "আমি একটি কবিতা লিখব"। এমন কি কোন মহৎ কবিও একথা বলতে পারেন না। কারণ কবিতা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত কিছু নয়; এমন কোন চিন্তা-ক্ষমতাও নয় যাকে আপন বুদ্ধিমত পর পর সাজিয়ে দেওয়া চলে।' এ শুধু মহৎ কবিতা সম্পর্কে নয়, সমস্ত রকমের সৎ শিল্পকর্ম সম্পর্কেই এ উক্তি প্রযোজ্য।

এই ব্যাঘ্রযুগে হরিণীর চোখের অপরিমিত চাঞ্চল্যের উৎসের খোঁজে পশ্চাৎপটের ঝিল্লিকে চিরে চিরে দেখার ইলাহি ব্যবস্থা আছে, অন্যথা বৈশ্য মানুষের দুর্দমনীয় কৌতূহল অপূর্ণ থাকে, প্রামাণিক সত্যে বিশ্বস্ত মন স্বস্তি পায় না। অনুরূপ উপায়ে প্রেরণার উৎসও চিরে দেখার চেষ্টা চলেছে, চলবে; এ স্বাভাবিক। সেই বুদ্ধিনির্ভর ব্যবচ্ছেদের ভার প্রামাণিক সত্যে বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ-দের অধিকারেই থাক। আমরা যারা স্পর্শাতীত অস্তিত্বকেও অনুভবে হাঁ বলে মানি, তারা খোলা চোখে এবং খোলা মনে বোঝবার চেষ্টা করি সেই বিচিত্র

শক্তির সৎ স্বরূপ যা অদৃষ্ট, যা তীব্র আবেগের দুঃসহ তাড়নায় শিল্পীকে শিল্পী-সৃষ্টিতে বাধ্য করে। যার হাতে শিল্পী যন্ত্র মাত্র; যে আপনি বাজে না, বাজালেই বাজে। এর অর্থ এই নয় যে, আমি কোন দৈবী শক্তিতে বিশ্বাসী। এ হল সেই মন্ময়ী-ভাব যাতে তন্ময় হলেই শিল্পী মুহূর্তে ভাবাক্রান্ত হয়। এবং এই বিশেষ ভাবাক্রান্ত মুহূর্তে তাঁর আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, সে সেই মুহূর্তে একান্তভাবেই শিল্প ভাবনায় নিবিষ্টচিত্ত শিল্পী মাত্র। তখন সে সাধারণ দশটি মানুষ থেকে স্বতন্ত্র, সম্বন্ধরহিত একজন, যে নি জর কাছেও নিজে অপরিচিত। অর্থাৎ ভাবাক্রান্ত মুহূর্তের আগে ও পরে যে সংসারের আর দশজনের মতোই স্বজন ও সুপ্রিয় সান্নিধ্যে আলাপে হাসিতে সাধারণ, ভাবাক্রান্ত মুহূর্তে তার চাইতে ভিন্ন একজন। সে তখন শিল্পী। বরং বলা যাক তখন সে যেন সেই আশ্চর্য ক্ষমতাবান পুতুল, যাকে যেখানেই রাখা হত সেখানেই আশ্চর্য রকম মানিয়ে যেত। এবং এই অপরিসীম ক্ষমতাই শিল্পীর শিল্পীত্ব। এই ক্ষমতার গুণেই সে ক্ষণে নরকে যায়, ক্ষণে স্বর্গে। ক্ষণে সঙ্গ দেয় দুশ্চরিত্রের, ক্ষণে অন্তরঙ্গ হয় সৎ-এর। এর ফলেই সে মুহূর্তে নারী, মুহূর্তে পুরুষ। কখনও বা অর্ধনারীশ্বর। এবং এই ভাবাক্রান্ত মুহূর্তে সে নির্বিচারী।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যাঁরা মন অর্থে শুধু হৃদয়কে বোঝেন এবং মনোঘটিত কার্যকলাপ মাত্রকেই যাঁরা তরল ও সরল কিছু মনে করেন তাঁদের জ্ঞানার্থে জানাচ্ছি, মন হল—অন্তরিন্দ্রিয় স্মৃতি বোধ বিবেচনা পছন্দ সংকল্প প্রবৃত্তি ইচ্ছা; এবং 'মনে মনে' মানে, কথা না বলে কেবল স্বগতচিন্তা। এক কথায় মনের কর্মকাণ্ড বিরাট। এবং মন্ময়ী ভাব হল এ সমস্তের সমষ্টি। জানি প্রতিপক্ষ প্রশ্ন তুলবেন, বুদ্ধি কি একেবারেই অপাংক্তেয়?

তার আগে, সচেতন মনে লিখতে বসার পর কোন এক মহৎ কবির তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সহোদরা লিখছেন—'উইলিয়াম টায়ার্ড হিমসেলফ্ উইথ হ্যামারিং এ্যাট এ প্যাসেজ।' তখনকার অবস্থা অনেকটা কৃষ্ণের মৃত্যুর পরে গাণ্ডীবে ছিলা দিতে অক্ষম অর্জুনের মতো। এবং প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তরের বলি—'না। বুদ্ধির কাজ পরবর্তী। অর্থাৎ ভাবাক্রান্ত মুহূর্ত অতীত হলেই বুদ্ধির বাহু মনকে অধিকার করে। তখন মন আপ্সে চলে না, বুদ্ধির হাত ধরে ধরেই চলে॥'

১৯৫৯

আপন স্বভাবের স্বাতন্ত্র্যে এবং ন্যূনতম সর্তেও সমন্বয়ের সুতীব্র অনিচ্ছায় বাইরে দূরে ঘোরা বন্ধ হলে, আপন মনের সুদূর নির্জনতায় যেখানে অজস্র স্মৃতি ও এলোমেলো স্মৃতির রেখার বিস্তীর্ণ জটিলতায় হারান পুরোণ ঘটনার অভিজ্ঞতার এমন কি ছেড়ে আসা প্রীতিস্নিগ্ধ কোন মমতাময়ীর অস্পষ্ট মুখ, অথবা এড়িয়ে আসা তীব্রদাহ কারও দৃষ্টির রেখাকে অবয়ব দেবার চেষ্টায় প্রবহমান মুহূর্ত-গুলোকে হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সে স্মৃতি মন্থনে স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, যেটুকু সান্ত্বনা সে শুধু অতীতের হারান নিজেকে আজকের ঘনিষ্ঠ অস্তিত্বে ক্ষণকালের জন্যে ফিরে পাওয়ায়। অবশ্যই এই পুনরাবৃত্তিতে সেদিনের রূপ রস গন্ধের রোমাঞ্চিত উপস্থিতি আংশিক, এবং স্পর্শের সেই শিহরিত চঞ্চলতা অসম্ভব, থাকলেও তা পরিবর্তিত, অতিমাত্রায় পরিমার্জিত, তবু ক্ষণ শিহরণের অল্পায়ু উত্তেজনা স্বাভাবিক এবং সেটুকুই সান্ত্বনা। নিঃসঙ্গ মানুষের পক্ষে এই স্মৃতিচর্চা স্বল্পকালের জন্যে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নিঃসঙ্গতা নির্মম। রুক্ষতায় সে অনন্য। দীর্ঘায়ু এই মানসিক অবস্থা স্মৃতির সঙ্গ দানকে দীর্ঘদিন প্রশ্রয় দিতে অরাজি, ফলে স্মৃতিচারণে ক্লান্তি আসে, বিরক্তি। এবং সেই বিরক্তি দুঃসহ এক অস্থিরতায় উদ্দাম করে জন্ম দেয় সুতীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষার, যা অতিমাত্রায় মাংসল; যা অন্তহীন প্রলোভনের ভ্রম সৃষ্টি করে অতিদ্রুত ঠেলে দেয় নিঃসীম এক বন্ধুর অন্ধকারে, যেখানে মুক্তির শুদ্ধ ইচ্ছা ক্রমে অবসন্ন, এবং ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করে জাগতিক সমস্ত কিছুর প্রতি অপরিমিত ঘৃণার,—যে ঘৃণার অনলে ফুলের শুচিতা ও আলোর শুভ্রতা মুহূর্তে ভস্মীভূত। অলোহীন, বাতাসহীন এই রুদ্ধশ্বাস মানসিকতার কুটিল ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণ্যমান অস্তিত্বে প্রাণের একমাত্র কামনা—নিষ্প্রাণ মৃত্যু। কারণ মৃত্যুতে এ জ্বালার নির্বাণ, অসহনীয় এ যন্ত্রণার ইতি। অর্থাৎ এ অবস্থায় আত্মহত্যার তীব্র তীক্ষ্ণ ইচ্ছা নিঃসঙ্গ মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে।

এই নিঃসঙ্গতার উৎস বহু। পরিমিত পরিসরে আলোচনার সংক্ষিপ্তি অনিবার্য, ফলে মুখ্যধারালোচনাতেই আমার দৃষ্টিভঙ্গি শরীরী করার চেষ্টা করব।

অপার সহিষ্ণুতায় আত্মগত হওয়ার অক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠকে বহির্মুখী হতে বাধ্য করে। বহির্মুখী মন স্বভাবতই স্পষ্ট ও সোচ্চার। যেহেতু ইচ্ছার তৃপ্তি তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, সেহেতু যে কোন সহজ মূল্যের বিনিময়ে সে তৃপ্তিকে আয়ত্ত করার স্বস্তি পেতে ইচ্ছুক। কিন্তু জটিল-গঠন এ সমাজে কোন তৃপ্তিই সুলভ নয়, ফলে তৃপ্তির বিনিময়ে সমাজ যে অপরিমিত মূল্য দাবি করে নানা কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে তা অসংগত বলেই মনে হয়। অতঃপর সে সদর ছেড়ে অন্দরের অলিগলি দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এখানেই বাছাই সম্পূর্ণ হয়। একদল যারা সংখ্যায় বেশি, শক্তির প্রচুর ক্ষয় জনিত স্বাভাবিক অবসাদে তথাকথিত বিজ্ঞজনের মতো দাবির অর্ধেক কি তারও বেশি ত্যাগ করে সন্ধিপত্রে সই করে, অন্যদল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরাই নিঃসঙ্গ। যেহেতু তারা ঘুলঘুলি দিয়ে গড়িয়ে পড়া একমুঠো রৌদ্রের স্বস্তি পেতে চায়না, চায়নি; যেহেতু তাদের আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত অবাধ রৌদ্রের। সামাজিক দৃষ্টিতে এরা অসামাজিক, এরা শত্রু। কারণ এরা সামাজিক বন্ধনে অরাজি, এবং উচ্ছৃঙ্খল।

মানুষের স্বভাবে সভ্যতার নীতিবন্ধের সংস্কার যে পরিমাণে ক্রিয়াশীল, আদিমতার সংস্কারও সমপরিমাণে, না সমপরিমাণে নয়, কিঞ্চিৎ বেশি মাত্রায় সক্রিয়। ইতঃস্ততঃ ছোটাছুটিকে নির্দিষ্টতা দেবার জন্যে সভ্যতা যে নিয়ম শৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে আসলে তা বন্ধনই। এবং এ বন্ধনকে অতিক্রম করার, ভাঙার ইচ্ছার মধ্যে যতটুকু মহত্ত্ব বর্তমান, ততটুকু দৈন্যও স্পষ্ট। কারণ ছন্দের সৌন্দর্য পরিমিত স্বাস্থ্যে। অপরিমিত অশ্রদ্ধেয় এবং বন্ধনের কড়াকড়িও। অর্থাৎ সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির ও বন্ধন মানার ইচ্ছা অসুস্থতা। সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির ইচ্ছা আদিম, সেখানে প্রবৃত্তির দাবিই মুখ্য, সে পাশবিক। এবং সর্বাত্মক বন্ধন মানার ইচ্ছে হল নিষ্ক্রিয়তা, সেখানে শক্তির বিকাশ ব্যাহত, সে হল দুর্বলতা যা ক্ষমারও অযোগ্য।

সভ্যতার স্রষ্টা মানুষ, সভ্যতার সৃষ্টি মানুষের প্রয়োজনেই। নীতি, নিয়মের বন্ধনে মানুষের শক্তির অপব্যয়কে সীমিত করার চেষ্টা অভিব্যক্তিকে সম্পূর্ণতা দানের জন্যেই। অবশ্য নীতি নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে তৎকালীন সদসদ্ জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয়, কাল পরিবর্তনে তার সংস্কারও অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু উচ্ছেদের ইচ্ছা সর্বনাশা। কারণ মানুষের স্বভাবের গভীরে সব কিছুকে তছনছ করে দেবার এক দুর্মর প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল, ফলে ভাঙার সর্বগ্রাসী খেলায়

মেতে উঠতে সে সময় বিশেষ অকুণ্ঠ। একে প্রশ্রয় দিলেই পশ্চাদপসরণ অনিবার্য। অস্তিত্বকে ধারণ করার ক্ষমতা-লুপ্ত আমরা ধ্যানের ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে পুনর্বার সেই সুদূর অন্ধকারের উৎসে ফিরে যাব, যেখানে আমরা উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। অর্থাৎ সভ্যতার দাবি, মানুষ সীমার বন্ধনকে স্বীকার করে অসীম হবে। তার জন্যে নিশ্চয়ই প্রয়োজন অপার সহিষ্ণুতার, অমানুষিক পরিশ্রমের। কারণ বহুর মধ্যে অনন্য হতে হলে, অসাধারণ হতে হলে, তপস্যার কঠোরতাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ বন্ধনে অরাজি হলে সিদ্ধি আয়ত্তে আসবে না। প্রসঙ্গত নেপোদের প্রশ্ন উঠবে যারা জন্মসত্ত্বে অথবা চোরাচালে দই লুটে নেয়, কিন্তু বলা বাহুল্য নেপোরা কালজয়ী হতে পারে না, কারা সহস্র চক্ষু মানুষের কাছে ফাঁকির কারবার বিলম্বে হলেও ধরা পড়ে। তবে তাদের নগদ প্রাপ্তিকে ঠেকান যায় না, কারণ সাময়িক ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত। এবং যে কোন উন্নততর সমাজেও এদের অস্তিত্ব থাকতে বাধ্য, কারণ মানুষ একই মুহূর্তে বস্তুর উভয় দিক দেখতে অক্ষম, স্বল্প সময়ে সম্যক বিচারের শক্তি ও দূরদৃষ্টি তার অনায়ত্ত, ধৈর্যশীল পাঠ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও ব্যবহারিক যুক্তি বুদ্ধি ও কার্য কারণ সূত্রের আপেক্ষিক সত্যজ্ঞান সব সময়ে সৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে না।

আসলে মানুষের শক্তির যথার্থ বিকাশের পক্ষে নিয়মের বন্ধন ও তথাকথিত ক্ষমতাবানের দল মোটেই বাধা নয়। মানুষ বাঁধা অন্যত্র।

যে মানুষ অবাধ স্বাধীনতা দাবি করে, সে জানে না যে স্বাধীনতা অবাধ নয়, হতে পারে না। আসলে স্বাধীনতা মানেই সবাধ মুক্তি, অর্থাৎ সীমিত মুক্তি। এই মুক্তি অবারিত অথবা অপ্রতিবন্ধ নয়। এর প্রতি পদে পদে বাধা, প্রতি পদক্ষেপেই বন্ধন। সে বন্ধন অন্যের দ্বারা চাপান নয়, আপনা থেকেই মেনে নেওয়া। অর্থাৎ স্ব অধীনতা—নিজের, নিজের শুদ্ধ বিবেকের অধীনতা। এ বন্ধন যেমন দুরূহ, তেমনি কঠিন, কঠোর এবং নির্মম। এ বন্ধন অবাধ ইচ্ছাতৃপ্তিকে যেমন প্রশ্রয় দেয় না, তেমনি অগাধ অধিকারও দাবি করে না। স্বাধীনতার প্রথম কথা পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক ও আপন শক্তি সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা। এ সচেতনতা যাদের নেই তারাই অবাধ স্বাধীনতার দাবিদার, আর তাদের কাছে অবাধ স্বাধীনতার অর্থ সমস্ত বন্ধন মুক্তি। অথচ স্বাধীনতা ও বন্ধন মুক্তির ব্যবধান দুই মরুর। প্রথম প্রার্থনা করে সম্পন্ন শুভাশুভ জ্ঞান; দ্বিতীয়ের আনন্দ যদৃচ্ছ ইচ্ছাপূরণে, উচ্ছৃঙ্খলতায়।

অবন্ধ হবার ইচ্ছা বিপুল। ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার জন্য বিপুর দাসত্ব করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবে উপস্থিত, অথচ তাকে অতিক্রম করার মধ্যেই যথার্থ মনুষ্যত্ব—যারা তা পারে না, তারাই দুর্মর প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে প্রথমে উদ্‌ভ্রান্ত, ক্রমে ক্লান্ত ও বিরক্ত এবং অতৃপ্তিজনিত বিষাদে দিগভ্রান্ত হয়ে সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির ইচ্ছায় মেতে ওঠে। আদিম ইচ্ছার তাড়না সৃষ্ট তাদের আচার ব্যবহার স্বভাবতই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ও বিশিষ্ট। অবশ্যই সেই বৈশিষ্ট্য অশ্রদ্ধেয়, যেহেতু তা একান্তভাবেই প্রাগৈতিহাসিক, অর্থাৎ আদিম। বাঁধা পথে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি এদের কাছে কোন সুখ উপঢৌকন দেয়না, অথবা বাঁধা পথের সুযোগ সুবিধা-গুলো এরা নানা কারণে গ্রহণ করতে অপারগ, ফলে বিপরীত রীতিতে যথেচ্ছ বিহারের অসুস্থ সুখ ও সুযোগ এরা দাবি করে। পরিণামে ব্যর্থতা এদের বহুর থেকে বিচ্ছিন্ন তথা কেন্দ্রচ্যুত করে ক্রমে নিঃসঙ্গ এবং বিদ্রোহী করে তোলে। অবশেষে এরা অস্তিত্বের সমূহ বিনষ্টির শান্তি খোঁজে, নয়ত আপন শক্তির প্রকাশকে বিপথগামী করে বিস্মরণের নিতল অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অনন্য হবার লুপ্ত-ইচ্ছা অগণ্যের দল ভারী করতে সাহায্য করে।

মূলতঃ মানুষের অধিকারের সীমাকে যথার্থ নির্দিষ্টতা দানের জন্যই সভ্যতার সৃষ্টি। সহস্র সহস্র বছর মানুষ ব্যয়িত হয়েছে এই দুরূহ কাজে। কখনো নীতিবন্ধের কড়াকড়ির মাত্রাধিক্য ঘটেছে, কখনো বা মাৎস্যন্যায়ের অধিকার মানুষ পেয়েছে। যুক্তি বুদ্ধি ও কালজ শুভাশুভজ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষের বিবেচনার বীক্ষণাগারে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষায় মার্জিত পরিমার্জিত হয়ে যে নীতিবন্ধ কালে কালে সংস্কারে পরিণত হয়েছে, হতে পারে সুবিধাভোগী দলকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তা হলেও তার স্বীকৃতিতে সাধারণের সমর্থন অস্বীকার করা অসম্ভব, উড়িয়ে দেওয়া কিছুতেই যায় না। সে সমস্ত নীতিবন্ধের প্রয়োজনীয় সংস্কার অনিবার্য মানি, সমূল উচ্ছেদের ইচ্ছা অসুস্থ। কারণ মানুষের পরি-পার্শ্বের আমূল রূপান্তর সম্ভব, কিন্তু চিত্তবৃত্তির সমূহ পরিবর্তন অভাবিত, যেহেতু মনোভূমি কিছুতেই বনভূমি নয়।

১৯৬০

উত্তর কৈশোরে দেহদিগন্তে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত যে আবেগ অকস্মাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের বিস্তৃত অ কাশকে দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে, উন্মুক্ত করে দূর বিসারিত বিশাল জীবনের দীপ্ত পটভূমি, সেই চরম ও পরম লগ্নে বল্গাহীন মাতাল অশ্বের দ্রুততা প্রাজ্ঞজন কর্তৃক যতই তিরস্কৃত হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে সদ্যোজাত যৌবনের পক্ষে তা স্বাভাবিক। তখন নীতিধর্মের ক্ষণ বিপর্যয়, বোধ-বুদ্ধির মাত্রাহীন বিভ্রান্তি, প্রতিবেশীর শ্রুতিকে বিড়ম্বিত করে উদ্দাম আবির্ভাব, সঙ্গত কারণেই স্বাগত। যেহেতু তখন সে যথার্থ যৌবন ধর্মে অনভিজ্ঞ, তার যৌবন-শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সে জানে না, যৌবন শুধু পুচ্ছ নাচানর ঋতু মাত্র নয়; যৌবন, পুচ্ছকে রাঙানর, তাকে ক্ষমাসুন্দর করে সাজানর ঋতুও। সেটুকু জানার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। উপদেশের বাড়াবাড়িতে তখন কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ হয় বেশি। কারণ হঠাৎ আলোর চমকে যার মনের আকাশে প্রতিমুহূর্তে সহস্র ফুল ফুটছে ঝরছে, সেই মধুলগ্নে ঠাকুর্দার কি তারও আগের আমলের পাথরের পরে খোদাই করা বাহারী নীতির ফুলগুলো যত মূল্যবানই হোক না কেন, তার কাছে তা ভার ছাড়া কিছুই নয়। সে তখন সেগুলোকে বিনামূল্যেও সংগ্রহ করতে অরাজী। জোর করলে ফল হয় উল্টো। কুঁড়ি থেকে ফুল হবার জন্যে যে সময়ের প্রয়োজন, যে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের ঘনিষ্ঠতার, তার অভাবে বিকাশ ব্যাহত হয়। বলা বাহুল্য কীটদষ্ট ফুলের রূপ দৃষ্টিসুন্দর নয়, সৌরভও অগ্রহণীয়। এবং তার দৃষ্টান্ত অজস্র। শুধু আমাদের ঘরে বাইরে নয়, বিদেশ বিভূঁয়েও।

তাহলে কি উঠতি যৌবনের সীমাহীন বেলেল্লাপনাকে, তার উদ্দাম ছোটাকে অবিমিশ্র প্রশ্রয় দিতে হবে? এবং অপেক্ষা করতে হবে তার অপরিসীম ক্লান্তির, যখন সে তার বিগত কর্মের জন্যে লজ্জিত হবে, অনুতপ্ত হবে স্মৃতির দুঃসহ ভারে, এবং আত্মশোধনে শুদ্ধ হবে, স্থিত হবে,—ততদিন পর্যন্ত?

যে বন্যা কুল ছাপান, যে স্রোতধারা খর এবং অবন্ধ, তাকে বালির বাঁধ নয় পলিমাটির পাঁচিল তুলে দিলে সাময়িক গতিরোধ সম্ভব, কিন্তু অন্তর্বহ যে বেগ, হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় সে কি গুমরে গুমরে পাঁচিলের গায়ে ছিদ্রান্বেষণ করে

ফিরবে না? সুযোগ পেলেই সে বেগ কি অচিরেই ছিদ্রের দুর্বলতাকে সুড়ঙ্গের সর্বনাশে পৌঁছে দেবে না? আসলে আশু ফলের সম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুততা মারাত্মক। তাতে শ্যাম কুল দুই-ই যায়।

বরং সেই বাচাল যুবকের কথা বাল, একালের কফিহাউস যার সবস্ব নিয়েছে; এবং সেহ যুবককেও। আমি হলপ করে বলতে পারি কিছুতেই তাকে কোন যেত না, সে যেতই;—যেহেতু সেখানে যৌবন জ্বলছে দাউ দাউ শখার মসৃণতায়, যেহেতু সেখানে যৌবন ক্ষণে দীপ্তমান, ক্ষণে মাতাল, ক্ষণে আতশাত্রায় বাচাল। এবং বলে রাখি এ কাফহাউস এ কলকাতার অলিগলিতে, রকে, হাটে, মাঠে সর্বত্র। যেখানে একাধিক যৌবন মিলিত হচ্ছে সেখানেই কফিহাউস। সেখানেহ কালের দূষিত হাওয়া বার বার ঝাপটা মারছে তার উন্মত্ত দাপটে সে টানছে, ক্রমাগত টানছে এবং সে টানের প্রবলতায যুগের রাখালরা ঘর ছাড়ছে, অবকাশকে ফুরিযে দিচ্ছে বাইরেহ। একালের কফিহাউস পদাবলীর কদমতলা। সেখানে জল ভরতে এখন যে রাধা আসে সে প্রেমের টানে আসে না, সে আসে প্রেম বেচতে। কত রকমারি তার প্রেম, কত বিচিত্র তার রূপ। যে যৌবন সে-সব পলকে দেখেছে সে মজেছে, সে মরেছে। সেই বাচাল যুবকও মরেছে। বয়সের হিসেবে যে যৌবনের মধ্যাহ্নে, অভিজ্ঞতার দুর্বহ ভারে সে এখন গতযৌবন প্রৌঢ়। তার চোখে একাল যেন রূপসী রাধা। এবং রাধার প্রেম? পরকীযা বলেই যেন সে অমূল্য। আসলে আজ যৌবনে সে শুধু পরকীযা সাধনই করেছে। উত্তব কৈশোরে পরের মুখে শুনেছে সে এখন যুবক, তার গলায় স্বর ভারি হযেছে, চলনে বলনে এসেছে ছন্দ, মুখে ছাপ পড়েছে তার। সে-ই প্রথম সে বিস্মযে নিজের অপরিচ্ছন্ন মুখ দেখল এবং শরণাপন্ন হল ক্ষুরের, পরিচ্ছন্ন হল। তারপর তার চেযে কিছু বড়র চোখে দেখতে সুরু করল জগৎটাকে। দেখল সহস্র বিস্ময়, শুনল রোমাঞ্চিত সহস্র সংবাদ। পরের কথা মত সে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করল। বুদ্ধি কিছু মাত্রায় ধারাল হতেই সে ভাবতে সুরু করল। নিজেকে উন্নীত করল সমালোচকের পদে। এবং ক্রমশ সে বুঝল বুদ্ধিজীবী হবার গোড়ার কথা। সে আওড়াতে লাগল অষ্টোত্তর শত নাম, অষ্টোত্তর সহস্র পুস্তকের মনগড়া উদ্ধৃতি। এবং সে কালের-কফিহাউসে স্ব-প্রতিভার দৌলতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা পেল। সে এখন বিশ্বকোষ। মান-ম্যানহাইম, পেক্-রোবসন,

টেগোর-ঠাকুর, পিকাসো-পিকাসোলী, মস্কো-সুকর্ণ সব, সব তার কণ্ঠস্থ। সে জানে অ্যাবসার্ডিটির গোড়ার কথা, সে দেখেছে সর্বত্রই ফ্রাস্ট্রেশান, সে শিখেছে এ্যাবসল্যুট কিছু নয়, শূন্য। এবং সে পান করেছে তীব্র মদ, স্বাদ নিয়েছে কড়া মাংসের। এ শহরের সহস্র গলিতে মাতালের মত ঘুরেছে, সে দেখেছে সবই। তার ধারণা, পাগলা মেহের আলির মতই তার বিশ্বাস, 'সব ঝুটা হ্যয়'। অতএব সে ক্ষণে আত্মহত্যা করার জন্যে মনস্থির করতে বসে, ক্ষণে উঁচু গলায় মাঝ রাস্তায় গান ধরে, কখনও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকদের ঝাণ্ডা পাঠোয় করে বক্তৃতা দেয়, কখনও বা অনর্গল রমণী-কামিনীদের কথা সবেগে ছুঁড়ে মারে। এবং সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সবাইকে বলে বেড়ায়— 'অমুক লেছে, আমার মধ্যে ইনসানিটির লক্ষণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে।' বলেই ক্ষণকাল চোখ বুজে থাকে, দেখে মনে হয় সে তখন বুঝিবা কোন মহাপুরুষের পদাভিষিক্ত হতে চলেছে। ওর ধারণাও অনুরূপ। সেই বাচাল যুবক একদিন হঠাৎ কালের কফিহাউস থেকে ছিটকে পড়ল, নিঃসঙ্গ হল। এবং সবাইকে অবাক করে সে যৌবন মধ্যাহ্নেই বিগতযৌবন প্রৌঢ় হল। কিন্তু না, পাগল সে হল না। সেই বাচাল যুবক এখন কদাচিৎ কথা বলে, তর্ক দেখলেই পালায়, আলোচনায় মাথা গলায় না, কিছু বললে মৃদু ঘাড় নেড়ে জানায়—'আমি ও সম্বন্ধে তেমন কিছু জানিনে। আমাকে মাপ করবেন।' যৌবন মধ্যাহ্নে মৃত বাচাল যুবার গম্ভীর প্রৌঢ়ত্ব পরবর্তী যৌবনবেলাকে সৃষ্টির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করবে এ আশা সংগত, যেহেতু আত্মসমালোচনায় এখন সে শুদ্ধ হবার, স্থিত হবার সাধনায় নিমগ্ন। এমন দৃষ্টান্ত এক নয়, অজস্র। তাই বলছিলাম, উত্থিত যৌবন কফিহাউসের মোহে ছুটে যাবেই, দেখবে চোখ মেলে জ্বলন্ত যৌবনের মসৃণ সৌন্দর্য, মাতাল হবে, বাচাল হবে, এবং বলি, সেই কুৎসিত আগুনে পুড়ে ছাই হবে, শুদ্ধ হবে। আপনারা কি ততদিন অপেক্ষা করতে অরাজী?

তাহলে যে প্রাজ্ঞম্মন্য শুষ্ক নীতি-ধর্মের ধারক ও বাহক তাকে কালের বিষবৃক্ষে কুঠার হানতে হবে, বিচ্ছিন্ন করতে হবে তার ছায়াকে দেহ থেকে, নইলে শুধু ডাল ছেঁটে পল্লবের সর্বনাশ হবে, বিষবৃক্ষের সমূহ বিনষ্টি সম্ভব হবে না। ধরে নেওয়া গেল মাটির যোগাযোগকে আইনের কড়াকড়িতে বিচ্ছিন্ন করা হল, কিন্তু শূন্যের? বিশাল ব্যাপ্ত আকাশের? তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে ফিরে যেতে হবে সেই সুদূর মধ্যযুগে, পুড়িয়ে দিতে হবে একালের মানুষের উদ্ভাবিত

বিস্ময়কর সমস্ত শোভন আধুনিক উপকরণ। কিন্তু সে অসম্ভব। সে হয় না। কেউই পারে না দীপ্ত যৌবনেব পায়চাবি ভুলে শৈশবের হামাগুড়িতে ফিরে যেতে। কেউ না। এমন কি অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী ঈশ্বরও নয়। তাহলে? ববং সেই বাচাল যুবাব স্মৃতিকে স্মরণে বেখে আমার পূর্বোক্ত কথার মৃদু পুনবাবৃত্তি কবতে পাবি যে, 'যৌবন শুধুমাত্র উদ্দাম পুচ্ছ-নাচানব ঋতু মাত্র নয়; যৌবন—পুচ্ছকে রাঙানব, তাকে ক্ষমাসুন্দব কবে সাজানর ঋতুও'। এবং বলতে পাবি সময়ে এ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম কবতে পারলে হয়ত শক্তির অপব্যয় রোধ সম্ভব, নয়ত বাচাল যুবকের অভিজ্ঞতার পুনবাবৃত্তি অনিবার্য।

আমার কথাকে মূল্য দেবার দায় যৌবনের নেই, আমিও মনে করি না। তবু যে-যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ, যে-যৌবনে পুষ্পের সমারোহ, সে-যৌবনে কেউ ফলের হাট বসালে, শুধু বিস্ময় নয়, সিদ্ধিব গৌববে মৃত বিশ্বাসও বুঝি পুনরুজ্জীবিত হয়, জীবনের নতুন মানে খুঁজে পাওয়া যায়। তখন যৌবনের যাদু স্পর্শে মর্তেব ধূলি সুবর্ণ হয়, স্পর্শে সে কী অপরিমিত শান্তি। সে শান্তি কি সত্যই দুর্লভ? হয়ত বা! নইলে কেন বাচাল যুবার স্মৃতিও আমাদের ক্লান্ত করে না? কেন একালের কফিহাউস এত তীব্র ভাবে আমাদের আকর্ষণ করে? কেন কবে?

আমবা কি সত্যিই মরণবিলাসী?

১৯৮০

নিজেকে নিয়ে মগ্ন ছিলাম, এখনও আছি। কি করব ? অসভ্য উত্তেজনায় আসাম যখন উন্মত্ত, সারা বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড যখন উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে অস্থির, যখন কলকাতা চরম বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুণে গুণে অধৈর্য, তখনও আমি, সাতাশোত্তর একজন বাঙালী যুবক, চিলেকোঠার সঙ্কীর্ণ পরিসরে বসে কালক্ষয় করেছি, আর রেডিওর মুখ খুলে অপেক্ষা করেছি আরো মর্মান্তিক, আরো দুঃসহ সংবাদের, যাতে আমার সহিষ্ণুতার, আমার ধৈর্যের শেষটুকুও লুপ্ত হয়ে যায়, আমি ছিটকে পড়ি। না, তা হল না। রেডিও কোন দুঃসংবাদ দিল না। বিশেষ সান্ধ্য পত্রে, দৈনিকে উল্লোল বেলাল্লাপনার, নারকীয়তার, মধ্যযুগীয় বর্বরতার সচিত্র সংবাদ পাঠ করে মূক হয়ে গেলাম। আমার, আমাদের কিছুই করবার ছিল না ? না। এখন আমি বুঝতে পারি, রোম যখন পুড়ছিল, তখন নীরো কেন বসে বসে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। কেন ? আমি স্পষ্টই জানি, দুঃসহতম দুসংবাদেও আমার আত্মমগ্নতা ব্যাহত হত না, বাড়ত না চিলেকোঠার সঙ্কীর্ণ পরিসর। যেহেতু আমি বাঙালী যুবক, যার মস্তিষ্ক চর্চার ঐতিহ্য আছে, যে যুক্তিসর্বস্ব বুদ্ধি দিয়ে স্বপক্ষে-বিপক্ষে সহস্র সিদ্ধান্ত খাড়া করায় শিক্ষিত, যে দৈহিক অপটুতায় ও সাহসের অভাবে নিতান্ত দুর্বল, অশক্ত ; স্বজনের শ্লীলতাহানিতে সে অক্ষম কিছুতেই বিব্রত হতে পারে না, বিব্রত হওয়া তার সাজে না। বহু উচ্চারিত সেই ঋষি-বাক্যের শেষার্ধ তার কাছে মূল্যহীন, যেহেতু সুখ-স্পৃহা তার তীব্রভাবে বর্তমান ; কিন্তু প্রথমার্ধ তার কাছে রক্ষা-কবচের মতই মূল্যবান, কেননা সে জানে, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন মন হলেই মোক্ষ হাত বাড়িয়ে দুয়ারে কড়া নাড়ে। আমি, সাতাশোত্তর বাঙালী যুবক, অতঃপর স্পষ্টতঃ স্বীকার করছি, আমি সেই চরম ও পরম মোক্ষ লাভের সাধনায় নিমগ্ন। আমার এ মগ্নতা কিছুতেই ভাঙবার নয়। কিছুতেই না।

আমি জানি, প্রাদেশিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না ; পূর্ববঙ্গ থেকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় মা-বোন হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হলেও, না ; অসমীয়ারা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলেও, প্রকাশ্যে নারীত্ব লুণ্ঠিত হলেও, না। আমি পারি না। আসমুদ্র

হিমাচলের কোথাও বাঙালীর ঠাঁই না হলেও, না। এবং সহিংস প্রতিশোধ? অসম্ভব! বুদ্ধ চৈতন্য গান্ধির শিক্ষাপুষ্ট আমার মানসিকতা সেই পাপাচারে অরাজি, এবং পণ্ডিতজনের রচনা পাঠে জেনেছি 'এই বিশ্বমানবিকতার যুগে জাতীয়তাবাদ সর্বনাশা'। যেখানে জাতীয়তাবাদ জ্ঞানিজনের মতে 'সর্বনাশা', সেখানে প্রাদেশিকতার ধূয়া কি নিরতিশয় ঘৃণ্য নয়? তাই আমি সর্বান্তঃকরণে প্রাদেশিকতাকে ঘৃণা করি। সহিংস প্রতিশোধ যেহেতু পাশবিক, সেহেতু যথার্থ মানুষ হিসাবে আমি তাকে সমর্থন করতে পারি নে। যিশু-খৃস্টের মতো তাই আমিও বলি—'যদি কেউ এ গালে তোমাকে চড় মারে, তুমি নীরবে ও-গালটা এগিয়ে দিও। সেটাই মানবিক। এর ফলে যে অন্যায়কারী, যে অমানুষ, যে পশু, সে সংযত হবে (যদি অন্যায়কারীর বুদ্ধি ও বিবেক থেকে থাকে)। নয়ত দুই গালে দুই চড় খেয়েও তুমি প্রতিবাদ কর না, কারণ তাতে তোমার মহৎ মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। অর্থাৎ অন্যায় অবিচার জেনেও তোমাকে মৌন থাকতে হবে, কারণ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। বলা বাহুল্য আমরা সবাই জানি যে অন্যায়ের বিচার ঈশ্বর করবেনই, তাঁর হাতে কারও রেহাই নেই, সুতরাং আমরা বাঙালীরা নিঃসন্দেহে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সহিষ্ণু জাতি হিসেবে পরম পিতার সার্টি-ফিকেট অব মেরিট সানন্দে গ্রহণ করব। সম্ভবত আমরা ততদিন অপেক্ষা করতে অরাজি নই।

নইলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কি করে ধারণা হল যে, এ-যাত্রায় আসাম কংগ্রেসের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে। কেন ওদের মনে হল না, পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসীরা (যারা বাঙালী) এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে সহরে সহরতলীতে দ্বিতীয় আসামের সৃষ্টি করতে পারে? না পারবে না ওরা জানত। জানত যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। এবং কলকাতা একটি মৃত-নগরী, আর পশ্চিমবঙ্গ একটি নিস্তেজ-রাজ্য। যে-বীর্যের বড়াই বাঙালীর ছিল, স্বাধীনতা তাকে খণ্ডিত করেছে, এবং পরবর্তী ঘটনাবলী বাঙালীকে স্বদেশে প্রবাসী করে ছেড়েছে। আজ কলকাতা কসমোপালিটান টাউন, সহরতলীও বাঙালীর হাতের আমলকী নয়। সে-কথা ওরা জানে, এবং এও জানে আজকের বাঙালীর দৌড় মিছিল মিটিং হরতাল পর্যন্ত। তার বেশি একটি কদমও নয়। আরও জানে ভবিষ্যতে বাঙালী নামে কোন জাতির অস্তিত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে থাকবে না, থাকতে পারে না। উদ্বাস্তু হয়ে তারা

কলকাতার

করেছি, জটলা করেছি, এবং ক্লান্ত হয়েছি। ফলে প্রমাণিত হয়েছে, আমরা যথার্থই নিঃস্ব। আমরা দীন হীন, আমরা ক্লীব। এবং প্রমাণিত হয়েছে আমরা পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের চাপে দুরাত্মা হইনি, আসলে আমাদের স্বভাবেই দৌরাত্ম্য ; তা না হলে আমরা কিছুকালের জন্যেও সৎবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে জ্বলে উঠতাম। কিন্তু সে দুরাশা।

অতঃপর আমি, সাতাশোত্তর শীর্ণদেহ বাঙ্গালী যুবক ভাবছি, আমরা কোথায় চলেছি? কোন পথে? পূর্ব-পাকিস্থান থেকে ছুটে এলাম, আসাম থেকে ছুটে আসছি, দণ্ডকারণ্যে আমাদের ঠাঁই হচ্ছে না, আন্দামানে আমরা অস্থির, উড়িষ্যায় না, গুজরাটে না, এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী মহানগরী কলকাতাতেও বাঙ্গালী অপদস্থ পদে পদে ; কি চাকরিতে, কি ব্যবসায়, কি রাজনীতিতে? এরপর আমরা কোথায় যাব? ইতিমধ্যে সহিষ্ণুতার যে দৃষ্টান্ত আমরা অন্যের সম্মুখে স্থাপন করেছি এই-ই কি আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আজ সবচেয়ে মর্মান্তিক যে দুঃখ, না দুঃখ নয় লজ্জা যে, পথে ঘাটে হাটে বাজারে শুধু আমরা মার খেয়ে যাব, সবাই মারবে, লুণ্ঠিত হব আমরা, অথচ আমরা কিছুই করতে পারব না ; এর চেয়ে দুঃসহ যন্ত্রণা আর কি আছে আমি জানিনে। আমি জানিনে একটি জাতির ক্লীবত্ব প্রমাণের জন্যে আর কিছু বাকি আছে কি না।

জাতিতত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই, সমাজতত্ত্বে আমার পারদর্শিতা নেই, এবং রাষ্ট্র-তত্ত্বে আমার জ্ঞান স্বল্প। আমি এ মুহূর্তে সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম, আমি আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর হাঙ্গেরি, তিব্বত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আরো অনেক রাষ্ট্রের নিরীহ জনসাধারণের স্বার্থে উচ্চারিত বাণীমালার মর্মোপলব্ধি করতে পারিনে—এ সমস্তই আমার অক্ষমতা। আমার এ অক্ষমতা আজ আরও দুঃসহ, যেহেতু পঞ্চশীল নামক সর্তাবলী আমার কাছে একগুচ্ছ শব্দের সমষ্টি মাত্র, যা অর্থহীন। অর্থহীন এজন্যে যে, পঞ্চশীলের প্রবক্তারও এ পঞ্চশীলের 'পরে আস্থা অল্প। আমার দৃঢ় ধারণা আমাদের বুদ্ধিমান প্রধানমন্ত্রীর এ হচ্ছে 'মূর্খদের জন্যে পাঁচমাত্রা'।

থাক, এ মুহূর্তে অপরের সমালোচনায় আমার ভীষণ অনিচ্ছা। আমি আমার কথা, আমাদের কথা ভাবছি।

যাদের পায়ের নিচে দীর্ঘ চোরাবালি, যারা অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম, আলো

হাওয়ার খবরে মেতে থাকা কি তাদের মূর্খতাকে সপ্রমাণ করে না? বরং বলি, অস্তিত্বের সমূহ বিপর্যয় যখন আসন্ন তখন সভ্যতার সংস্কৃতির শিল্পের সাহিত্যের, সর্বোপরি সভ্যরুচির বড়াই করা কি অর্থহীন নয়?

আমি জানিনা। জানিনা যেহেতু আমি একজন অতি সাধারণ সাতাশোত্তর বাঙালী যুবক, আমার অভিজ্ঞতা অল্প, আমার জ্ঞান সীমিত, আমার বুদ্ধি অপক্ক। কিন্তু প্রাজ্ঞ যাঁরা তাঁরা কি এহ অন্তিমে শুধু নেতি-নেতির প্রলেপ আর কাগজে কাগজে অর্থহীন আবেদন নিবেদন করেই ক্ষান্ত হবেন? তার বেশি কিছুই কি তাঁরা করবেন না?

আসামের একদল শিবা সারমেয়র উল্লসিত হুঙ্কারে আমার, আমাদের শ্রুতি বিপর্যস্ত। আমি, আমরা কি নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকব, যেমন ছিলাম, যেমন আছি? এবং আমাদের স্বল্পায়ু অবশিষ্ট সামান্য উত্তাপ দিয়ে আমরা কি শুধু কথারই প্রদীপ জ্বেলে যাব? আর কিছু করব না?

১৯৬০

গতকাল সন্ধ্যার অস্ফুট কোরক আজ সকালে আমার গাছে অপরূপ ফুল হয়ে ফুটল। আমার মনে হচ্ছে এমনটি আর কোথাও হয় নি। আমার এতদিনের যত্ন প্রীতি ভালবাসা, আমার মমতা, আমার পরিশ্রম, সব যেন পল্লবের পরিসরে আশ্চর্য এক সম্পূর্ণতায় সশব্দে উচ্চারিত। এর যেন তুলনা নেই, একটু আগেও তুলনা ছিল না, একটু পরেও থাকবে না। অথচ এর আগেও কত সাজান বাগান আমি দেখেছি, কত ফোটা ফুল আমাকে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু এমনটি যেন কেউ নয়।

এ এতদিন কোথায় ছিল? আমার যত্নের গভীরে প্রীতির মর্মে, ভালবাসার আড়ালে, নাকি মমতার নিবিড়তায়, পরিশ্রমের উৎসে? হয়ত আমি জানিনে। তবু সে ছিল তার মাধুর্যে লাবণ্যে অপরূপতায়। অথচ সে স্পষ্ট হল এই প্রথম, প্রথমবারের মত আমার অনুভবে। পরে হয়ত এমনি ফুল আরও ফুটবে, আরও কিন্তু কিছুতেই এমনটি আর আমার মনে হবে না। কিছুতেই না। সেদিনও হয়ত এমনি অঝোর ঝরণ বৃষ্টিধারা অনর্গল আমার টিনের চালে প্রগলভা রমণীর মত আপন মনে কথা বলে বলে ক্লান্ত হবে, হয়ত সামনের বাগানের যুবক গাছগুলো কি কৃপায় ধৈর্যে শুনে যাবে সে সব কথা, 'র' আকাশ এমনি ঝুলে থাকবে আমার একফালি বারান্দার উপরে, বৃষ্টি ভেজা পাখীগুলো ছুটোছুটি করবে দূরে কাছে, কোথাও বা বৃষ্টি ধুর বিরহিনীর কান্না গান হয়ে বাজবে কলের মুখে— তবুও আমার আর এমনটি মনে হবে না। এ যেন এই প্রথম, এ-যেন এই শেষ।

আসলে কোন এক সুদূর অতীতে আমাকে কেউ সুখ দিয়েছিল, আমি পেয়েছিলাম, অদূর অনাগতে আবার কেউ দেবে. আমি পাব- আমরা এই আকাঙ্ক্ষাতেই বাঁচি, বেঁচে থাকি। নইলে অসহ কোলাহলের, অসংখ্য ক্লেদের পূতিগন্ধময় পৃথিবীতে কেই-বা সাধ করে বাঁচতে চায়? কী আছে? কোথাও বিন্দুমাত্র নিশ্চিত নেই, প্রসারিত ভবিষ্যতের সবটুকুই সীমাহীন অন্ধকারে ঢাকা, বর্তমানের পথটাই কী ভীষণ বন্ধুর। কোথাও পিছলে-পড়া মসৃণতা, কোথাও হামাগুড়ি খাওয়া কর্কশতা। যতটুকু চলা ততটুকু যেন আয়ুকে মুঠোয়

নিয়ে রক্ত মুখে তুলে তুলে চলা। এই যে বিপুল পরিশ্রমের ব্যয়, কতটুকু মূল্য তার পাই? অতি নগণ্য। তবু যদি পরিচ্ছন্নতা থাকত, স্বল্পমাত্রায় রুচি তাহলেও স্বস্তি পাওয়া যেত, কিন্তু তা দুর্লভ। এত সত্ত্বেও আমরা বাঁচি। আকাঙ্ক্ষা আমাদের নিরবধিকাল বাঁচব। কারণ ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি বাঁচার সুখ অপরিমিত—শুধু বেঁচে থাকার। তার জন্যে কখনও বিনা আমন্ত্রণে দুর্দৈবকে মেনে নিই সহজে, দুঃখ যন্ত্রণা অস্বস্তিকেও। আসলে যে-সুখ সুখের ছলনা মাত্র, সুখ নয়— যা একান্তভাবেই বাহ্যিক, তাকে নয়, যে-সুখ একান্তভাবে আন্তরিক, যে আমাদের ধ্যানে তপস্যায় এবং অনুভবে সত্য, সে সুখের তাড়নায় আমরা বাঁচি। তাছাড়া আরও একটি সত্য যা একই মুহূর্তে নির্মম এবং মধুর, তা হল জীবন দেবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তে নয়, ফলে আত্মহননের অধিকারও অস্বীকৃত। যদি কেউ বলে, আত্মহত্যার প্রবণতা মানুষের স্বভাবে —কথাটা স্বীকার করি, কিন্তু স্বভাবের সমস্ত প্রবণতাকে যদি মর্যাদা দেবার প্রশ্ন ওঠে তাহলে মানুষের সংজ্ঞাটাকে নতুন করে ঝালিয়ে নেবার প্রয়োজন নইলে মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব খর্ব করা হবে, তাতে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি হবে না সত্য, কিন্তু সভ্যতা পিছিয়ে পড়বে। এবং স্পষ্ট উচ্চারণই ভাল যে, যদি কারও ইচ্ছায় স্বভাবের সমস্ত প্রবণতাকে মূল্য দেবার দুর্বুদ্ধি প্রশ্রয় পায়, তবে সে দিক, কারণ পৃথিবীটাকে যতদূর সম্ভব বাসযোগ্য করার জন্যে এমনতর দুঃশাসনদের অবলুপ্তি নিশ্চয়ই জরুরি।

আসলে আমরা কারো মৃত্যু কামনা করিনে, তবু মানুষ মরে; কেউ আত্মহত্যা করলে আমরা আঁতকে উঠি, সে আমাদের অপছন্দ, কাউকে হত্যা করলে অথবা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে, আমরা দুঃখ পাই, চমকে সতর্ক হই। আসলে স্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হবে, বারণ সেটা দেহস্বভাব। কিন্তু আত্মহত্যা, অথবা মৃত্যুদণ্ড? এই দুয়ের প্রথমটায় ভুল আমার-আপনার, দ্বিতীয়টা একান্তভাবে চাপিয়ে দেওয়া। যারা আত্মহত্যা করে, তারা ভুল করে; তারা সর্বতোভাবে বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেয়। আসলে ওরা বুঝতে চায় না—এ-সংসারে পাওয়ামাত্রই সুলভ নয়, সবুরে তাতে ফুল ফোটে, ফল ধরে। সব প্রাপ্তিই অমানুষিক পরিশ্রম দাবি করে, অপরিমিত ধৈর্য। যাদের ধৈর্যের বালাই নেই, যারা অসহিষ্ণু, যারা একটুকুতেই মরিয়া হয়ে ওঠে, তারা আত্মহত্যা করে। কিন্তু একটি সাধারণ কথা তারা বোঝে না যে, এ-সংসারে বেঁচে থাকলে সম্ভাব্য সব কিছুকেই আয়ত্ত করা সম্ভব, অবশ্যই তার

জন্যে প্রচুর পরিশ্রম, অসহ কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। যারা তা করতে অরাজি তারা পালাবাব পথ খোঁজে। আত্মহত্যা এক রকমের পলায়ন।

সভ্যতার মানদণ্ডকে সুস্থিরতা দেবার জন্যে ধরে-বেঁধে সমস্ত কিছুকে নির্দিষ্ট করা হল, কিন্তু মানুষের প্রবণতা, তার প্রবৃত্তির গতি বহুমুখী। নিত্য-নূতন আবিষ্কার, অভূতপূর্ব উপকরণের সমাবেশ কালে কালে মানুষের অনেক সুপ্ত বৃত্তিকে, প্রবণতাকে জাগরিত করল, অথচ বিচার-পদ্ধতি রয়ে গেল সেই পুরনো আমলে, তার যথার্থ সংস্কার করা হল না। যদি হত তাহলে পাপবোধের পরিবর্তন হত, পাপের সীমা সঙ্গত কারণেই সংকুচিত হত। তাছাড়া স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিমানের অসঙ্গত ঐশ্বর্যের আয়োজনের পাশে বহুর অপ্রাপ্তি ও ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ স্বাভাবিক কারণেই মারমুখী হবে, এ ত চিন্তাশীলদের না জানার কথা নয়। তাহলেই প্রশ্ন হল, যেখানে গলদ সম্পূর্ণভাবেই সমাজ-ব্যবস্থায়, সেখানে দণ্ডের শাসনেব কঠোরতা কি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়? এবং মৃত্যুদণ্ড কি অমানুষিক নয়? এ-কথা বলার কারণ কোন মানুষই জন্ম অপরাধী নয়, অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতা এবং পরিবেশ পরিপার্শ্বের চাপেই অপরাধ করে এবং একটি অপরাধের প্রাপ্য দণ্ডের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ক্রমান্বয়ে সে অপরাধী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমার কথা হল, মৃত্যুদণ্ড সবদিক থেকেই নির্মম। যে-কোন গুরুতর পাপের জন্যেও মৃত্যুদণ্ড কঠিন, কঠোর। কারণ মৃত্যু সর্বনাশা, সে চরম সমাপ্তি। এ গুরুদণ্ডের কোন তুলনা নেই, এ অ-মানবিক।

বিশাল এ বিশ্বে তার ধূলোমাটির রূপ-রঙের, আলো-হাওয়ার বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে সমস্ত প্রাণেরই বাঁচবার অধিকার জন্মস্বত্বে স্বীকৃত। ব্যষ্টি মানুষের, যাঁরা শাসক তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির, বিদ্যার, মহত্ত্ব যতই থাক তবুও বলব, জীবন হরণের কোন অধিকার তাঁদের নেই। যে-শাসন প্রাণহননেও হাত বাড়ায়, সে-শাসন নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। সে-শাসন, শাসনই নয়। যদিও এ-শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা এ মুহূর্তে আমার চিন্তায় অনুপস্থিত, যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এ-শাসন জড়িত, আমি এ মুহূর্তে মৃদু সংস্কারের পক্ষপাতী। কাবণ কোন সর্বনাশা পাপের মূল্য হিসাবে মৃত্যু একেবারেই অসঙ্গত। বড্ড বেশি রকমের মূল্য দেয়া হয়ে যায়। অথচ অন্যায় করার, পাপ করার প্রবৃত্তি মানুষের আদি স্বভাব। সত্য বটে আমরা সভ্যতার ছদ্মবেশ

কলকাতার

পরেছি, কিন্তু আদিমতা কি অলক্ষ্য? মাত্রার তফাৎ থাকতে পারে, আদতে আমরা সবাই আদিম। তাছাড়া স্খলনের, ভুলের, বিভ্রান্তির সবটাই সবক্ষেত্রে পরিকাল্পিত নয়। কখনও মুহূর্তের উত্তেজনায়, কখনও বা চক্রান্তকারীদের চক্রান্তে অঘটন সংঘটিত হচ্ছে। তাও বা কেন, যদি ধরে নিই সুপরিকল্পিত, তাহলেও ভাববার থাকে যে, কি অবস্থায় কোন চাপে পড়ে এমনতর অনর্থে মানুষ মেতে উঠেছে? শুধু মাত্র শাসক হিসেবে নয়, বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ হিসেবেও এ-ভাবনার দায় আমাদের। যেহেতু ভুল করা মানুষের স্বভাব, ভুলকে অতিক্রম করাও, শুধু সে জন্যেই সংশোধনের সুযোগ মানুষকে বার বার দিতে হবে। তাছাড়া গুরুদণ্ডের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও প্রাত্যহিক দিনপঞ্জীতে অঘটনের সংখ্যা ত স্বল্প নয়, বরং বৃদ্ধির দিকে। অতঃপর আমার বক্তব্য কিছুদিনের জন্যে না হয় দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করা হক, যখন আমরা জানিই যে সভ্যতা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বকে চূড়ান্ত বিকাশের পূর্ণতা দেবার জন্যে, তাকে বিশিষ্ট মানে পৌঁছে দেবার জন্যে, ক্লান্তিহীন নিরীক্ষা। কোন এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালে মানব-সভ্যতার চলিষ্ণুতা কি ব্যাহত হবে না?

জীবনের স্বপক্ষে এ কথাগুলো উচ্চারণ করার কারণ দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন যত্নে প্রীতিতে, ভালবাসায়, মমতায়, এবং অশেষ পরিশ্রমে আমার গাছে আজ সকালে গতকাল সন্ধ্যার অস্ফুট কোরক সুন্দর একটি ফুল হয়ে ফুটেছে। আমাদের আজকের সভ্যতা কি তেমনি একটি পরিণত ফুলের সমৃদ্ধি দাবি করবে না?

১৯৬০

শেষ মাঘের সেই সমস্ত নিষ্পত্র ডালে ছায়া ধরেছিল ফাল্গুনে, চৈত্রে তাদের মরি মরি সে কী মহেন্দ্র-নিন্দিত কান্তি। যেদিকে তাকাই ডালে পাতায় ফুলে সে অপরূপ, যেন তার অন্ত নাই গো নাই। সে অনন্ত। দিনে রৌদ্রের সতেজ চুমায় তার কী উদ্দাম প্রফুল্লতা, রাত্রে অবাধ হাওয়ায় তার অগাধ কেশের সে কী নির্মল আকুলি বিকুলি।

গত রাতে সে আমাকে একটুও ঘুমুতে দেয়নি, আজকের সারা সকাল দুপুর পুরো বিকেলটা কাটিয়েছি তার চোখে মন রেখে, চোখ রেখে। তবু তার মন পাইনি। তবু সেধ্ধরা। অথচ সে আমার দুয়ার অদূরের বাগানে বিরল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখছি—তার রূপে আমার চোখ মন ডুবে যাচ্ছে, তার টলমল লাবণ্য গলে গলে ধারা হচ্ছে আমার স্পর্শের সীমায়, তার অনিন্দ্য সুবাসে আমি সিক্ত। তবু সে আমার নয়। আমি তাকে একান্তভাবে আমার ঘরের নির্জনে আমার আপন অস্তিত্বের মতো কোনদিন পাব না। সে চিরদিন আমাকে রূপে ভোলাবে, আসঙ্গের উষ্ণতায় সে আমাকে উত্তপ্ত করবে, কিন্তু কিছুতেই আমার 'আমি'র মত আপন হবে না। নাই বা হল, তবু ফুলের হাটে আমার আনাগোনা ত বন্ধ হবে না। তাহলে দুঃখ কিসের? চোখ জোড়াকে খুলে রাখব চিরদিনের মত, মনের জানলার পাল্লা দেব না কোন দুঃসময়ে, মাঝে মাঝে অতর্কিতে ঘুম ঘুচবে, আমি জেগে থাকব যতক্ষণ সে জাগিয়ে রাখবে ততক্ষণ, কি তারও বেশি।

কিন্তু সে আমার নয়। কেন নয় আমি বুঝি না, বুঝিনে। ওরা বলছে সর্বনাশ শুধু দরজার কড়া নাড়ছে না, ঘরের ভিতরেও আলগা করে ছাড়ছে। দেখছ না চারদিকে কত কলঙ্ক, কত কোলাহল? দেখছ না সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, ধ্বসে পড়ছে? কোথায় সেই ভালবাসা, সেই প্রেম, সেই রমণীয় প্রীতি? কিচ্ছু নেই। সব গেছে, সব যাবে। আমার বিশ্বাস হয় না। কোথায় যেন দ্বিধা বাজছে মনে, মন বলছে—ও সত্যি নয়। নয়ই ত!

নির্জনতা নিরবধি হক এ আমার অপছন্দ। সে প্রায় মৃত্যুর সামিল। এবং

অকলঙ্ক জীবন অবাস্তব, না অবাস্তব নয়, অসম্ভব। কারণ মানুষ ঈশ্বরকে পেতে চায়, ঈশ্বর হতে চায় না—যেহেতু ঈশ্বর নিরাকার, সে নির্গুণ। যেহেতু সে এমনি অনেক কিছু যা মানুষ নয়, যা মানুষের স্বভাবে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বড় জোর মানুষ দেবত্ব চায়, কিন্তু দেবতারা নিষ্কলুষ নয়। তাঁরাও কোলাহলপ্রিয়, তাঁদের কলঙ্কও অত্যল্প নয়। তবু মানুষ দেবত্ব চায়, প্রথমতঃ ক্ষমাশীল হবার জন্যে, দ্বিতীয়তঃ অমরত্বের লোভে। বরং বলি দেবত্বও নয়, ঋষিত্ব। এবং তা বনের নয়, মনের। বলা বাহুল্য তার সম্পূর্ণটাই ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নয়, ভোগকে সহজে ডিঙিয়ে। সে দুরূহ। এর বেশি আকাঙ্খা আর যারই হোক মানুষের নয়। তবু বিজ্ঞজনের এত হাঁক-ডাক, এত সতর্কবাণী উচ্চারণ কেন?

এ সংসারে যাঁদের আমরা বিজ্ঞজন বলি সাধারণতঃ তাঁদের সবারই বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। এবং তাঁদের বয়সের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বর্তমান, তাঁরা পূজনীয়। তবু বলি উত্তর পঞ্চাশে অধিকাংশ লোকই স্মৃতিচারী। বলা বাহুল্য স্মৃতি অতিরঞ্জনে সিদ্ধ, স্মৃতি প্রতারক। এবং এদেশের যুবদল যারা ওঁদেরই উত্তর-পুরুষ স্বভাবতঃই ওঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত, ফলে সে-শিক্ষা কু-শিক্ষা। কারণ আমি আমার পিতৃপুরুষের রক্তের ধারক সন্দেহ নেই, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না আমি তাঁদের উত্তরপুরুষ মাত্র। এবং রক্তের সামান্য মিল ছাড়া কি শিক্ষায় দীক্ষায়, কি মননে অনুশীলনে সম্পূর্ণ নতুন একজন। আজকের আমাকে যদি ধূমপানের নেশা করতেই হয় তাহলে সেই সনাতন হুঁকো অচল, আমাকে সিগারেট ধরতেই হবে, কারণ নিত্য হুঁকো পরিষ্কার করার লোক আমার নেই, টিকে ধরাবার ধৈর্যও না। অর্থাৎ সেই সাত অশ্বশক্তিসম্পন্ন মোটর কখন ক্রমে সাতশ' অশ্বশক্তিসম্পন্ন বিমান হয়ে গেছে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞজনরা তার সঠিক হিসাব রাখেন নি। ফলে তাঁদের পিছুটান প্রবল, তাঁদের স্মৃতি এখনও পায়চারি করছে সেই সব শুদ্ধপ্রাণ মুনি-ঋষিদের বিজন অরণ্যে, আর টাকায় সাতমণ চাল পাওয়া যেত এমন প্রায়-প্রাগৈতিহাসিক প্রবাদের রাজত্বে। তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন যে, টাকায় যখন সাত মণ চাল পাওয়া যেত তখন এই দুর্ভাগা বাঙলা দেশের লোকসংখ্যা সাত কোটি ছিল না। এবং তাঁদের নিদারুণ দুশ্চিন্তা তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে, যেহেতু তারা কালস্রোতে একেবারে বয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার সবিনয় নিবেদন, একালকে নিশ্চয়ই তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধররা সৃষ্টি করে নি, একালকে বর্তমান যুবকদের পূর্বপুরুষরা

পায়ে পায়ে এগিয়ে এনেছেন। এবং যদি তাঁদের স্মৃতি তাঁদের প্রতারণা না করে তাহলে তাঁরাই স্বীকার করবেন—একালের যুবকদের পিতামহরা এই যুবকদের পিতাদের নিয়ে কম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাননি; সম্ভবতঃ অনুরূপ ভবিষ্যৎবাণী তাঁদের ভাগ্যেও জুটেছে। তা সত্ত্বেও যদি তাঁদের ধারণা হয় তাঁরা বয়ে যান নি, তাহলে বিনীতভাবে বলি, একালের যুবকদের জন্যেও দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই, সে নিরর্থক। কারণ প্রবাদ থাকা সত্ত্বেও বাপের বেটা হুবহু বাপের মতো হয় না, হবে না। আমার পিতা এবং পিতামহর পার্থক্য অনেক। আমার পিতার সঙ্গে আমার মিল সামান্যই। আমার পিতা ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, আমি অতিমাত্রায় নগণ্য একজন লিখিয়ে, এবং আমার পিতামহ ছিলেন নৌকার মাঝি। অবশ্য মাস্টারের ছেলে মাস্টারও হয়, কেরানির ছেলে কেরানি। কিন্তু সেখানেও তফাৎ বিস্তর—স্থূলার্থে সূক্ষ্মার্থে উভয়ত।

আসল কথা খাঁটি ঘৃতের ঢেঁকুর তুলে আজ আর কাজ নেই, বরং বনস্পতির কথা বলি। হতে পারে তার খাদ্যপ্রাণতা স্বল্প, সম্ভবত স্বাস্থ্য-হানিকরও। কিন্তু উপায় কি? আমাদের পূর্বপুরুষরা যে বন কেটে বসত করেছেন উত্তর-পুরুষদের জন্যে। অর্থাৎ আমরা সংখ্যায় বেড়েছি একের পিঠে অসংখ্যের মত। ফলে একের জন্যে যে নিয়ম কল্যাণকর ছিল, অসংখ্যের জন্যে সে নিয়ম অচল। তাই অশ্বমেধে একালের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না, হবার নয়; একালের যজ্ঞে নরমেধই প্রশস্ত। একালে রাম রাজত্বের আশা পোষণ প্রায় মতিভ্রমের কাছাকাছি, সে অসম্ভব। সুতরাং কোলাহল স্বাভাবিক। এবং কলঙ্ক? কলঙ্ক কাকে বলছি? পুরনো মানদণ্ডে আজকের ঘটনা-দুর্ঘটনাকে বিচার করলে সন্দেহ নেই কলঙ্ক অপরিমিত, তার অবধি নেই। কিন্তু তার আগে বিচার করা প্রয়োজন সেই মান্ধাতাই মানদণ্ড আজও তেমনি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কিনা, নাকি তাতে মরচে ধরেছে?

সন্দেহ কি সেই মানদণ্ডে মরচে ধরেছে। আমাদের অসূর্যম্পশ্যা ঠাকু'মাদের নাতনিরা এখন জীবিকার দায়ে ভিড় ঠেলে দশটা-পাঁচটার অফিস করছে, গৌরীরা প্রায় প্রৌঢ়া হয়ে ম্যারেজ রেজিষ্টারের এজলাসে যেন তেন প্রকারেণ সই করে সঙ্কীর্ণ গলির অন্ধকারে বিবর্ণ মধুচন্দ্রিমা যাপন করছে, এবং একালের কুলীনদের পক্ষে শতদার পরিগ্রহণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। প্রসঙ্গত আরও বলি, সেই সব বৌমারা ক্রমে বিরল হয়ে আসছে, আসবে—যারা মরতে

মরতেও স্বামীর শ্বশুরের সেবা করত। কারণ উপায় নেই। কালের হাতছানিতে আমরা সবাই সাড়া দিয়েছি, আমাদের চোখ খুলে গেছে। এই চোখ খোলা অবিশ্বাস্য রকমের শুভ। এতে শক্তির বিকাশ অব্যাহত হবে, স্বভাব হবে অবাধ। রীতি-নীতির পুতুল না হয়ে হয়ত এবার আমরা যথার্থই মানুষ হব। এবং এই মানুষের বিচারে পুরনো মানদণ্ড মোটেই সচল নয়।

সম্ভবত প্রতিপক্ষ আমাকে পশ্চিমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে ইঙ্গিত করছেন সর্বনাশা সম্ভাবনার। আমি মানছি পশ্চিমের চলা এখন প্রায় চক্রব্যূহে বিপর্যস্ত অভিমন্যুর মতো। কিন্তু অভিমন্যুরা এককালে একবারই বিপর্যস্ত হয়, বার বার বিভ্রান্ত হয় না। তা ছাড়া প্রাচ্যের অভিমন্যুদের পথ হুবহু পাশ্চাত্যের অভিমন্যুদের মতো নয়। দেশভেদে জাতিভেদে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বের ভিন্নতায় অগ্রগতি পশ্চাদ্‌গতি মোটেই এক এবং অনুরূপ হয় না। তা ছাড়া জীবন ত একরাশ বিপর্যয়ের বোঝা, একগুচ্ছ অনিশ্চিতি। কবে বিপর্যয় ছিল না? অথবা কোথায় ছিল নির্মল নিশ্চিতি? ঋষিদের ছিল রাক্ষসভীতি, আমাদের ভয় হাইড্রোজেন বোম। দুই-ই প্রায় তুল্যমূল্য। তবু ওঁরা জীবন থেকে পালান নি, এবং হলফ করে বলছি আমরাও ফুঁয়ে উড়ে যাবার মত নই। অতএব আগে কহ আর।

আসলে কোথাও কলঙ্ক নেই। জীবনের বৃহৎ মহৎ লীলার অঙ্গীভূত সবই শুদ্ধ, সবই সুন্দর। গোড়ার কথা, দেখা। চোখের দোষে সুন্দরকে যদি কুশ্রী মনে হয় সে দোষ সুন্দরের নয়, চোখের। তা ছাড়া আছে অনুশীলন। দেখার অনুশীলন। সাদা চোখে সব কিছু দেখা যায় না, বাঁকা চোখেও নয়। দেখার চোখ তৈরী করতে হয় দিনে দিনে, মাসে, বছরে। এবং পুরনো চোখে নতুন জিনিষ দেখা যায় না, নতুনকে নতুন চোখে দেখতে জানতে হয়। এই দেখতে জানাই সব বিচারের গোড়ার কথা। কি শিল্প বিচারেব, কি মনুষ্য বিচাবের। স্বভাব দোষে যদি সুন্দবকে কুৎসিৎ করে তুলি তাতে নিজের নিকৃষ্ট রুচিই প্রমাণিত হয়, সুন্দর অসুন্দব হয় না। অর্থাৎ আমাদের স্বভাবেব গভীরে কুৎসিৎ প্রীতির যে প্রবণতা বর্তমান, তাকে নির্মূল কবতে না পারলে সৌন্দর্যের উদ্বোধন সহজ হবে না, আমরা দুর্লভ জীবনকে ধিক্কৃত করব বীভৎস বিশেষণে তাকে ঐশ্বর্য সম্পন্ন করতে পারব না। অথচ জীবন নিয়ে ছেলেখেলার কোন

অধিকার আমাদের নেই, যেহেতু জীবন নিরবধি নয়। স্বল্পকালের সীমায় তাকে সম্পূর্ণ হতে হবে, নইলে সীমাহীন ব্যর্থতা আমাদের প্রস্থানকে করবে কলঙ্কিত। মহৎ জীবনের অধিকার পেয়েও মহৎ মৃত্যুর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে আমাদের।

সুতরাং যথার্থ মানুষ হবার জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন অভয়। সে অভয় সমস্ত কিছু থেকেই। কি ধর্ম, কি নীতি, রীতি, আচার-আচরণ বিধি-বিধান সমস্ত কিছু থেকেই। এমন কি বিজ্ঞজনের সতর্কবাণী থেকেও। আমি আদৌ মনে করি না কোন সতর্কবাণীর প্রয়োজন আছে। বরং বাধাগুলো যদি অপসারিত হয় তাহলেই দেখা যাবে জীবন অফুরন্ত পল্লবে পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে। ক্লেদ বিকার বিকৃতি সব উধাও হয়ে যাবে মুহূর্তে, ঋতুবদল হবে স্বভাবের নিয়মে, ঠিক প্রকৃতির ঋতুবদলের মতো। তখন যা স্বাভাবিক তাকে অস্বাভাবিক চোখে দেখার দায় থাকবে না, বয়ে যাওয়ার ভয়ও নয়। নদীর স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সে সহজে সমুদ্রে যাবে।

অবশ্যই এ প্রস্তাব একান্তভাবে আমারই। কখনও এ প্রস্তাব ফলপ্রসূ হবে কিনা জানি নে। যদি নাও হয় তাতে ক্ষতি নেই, যেহেতু আমার চোখজোড়াকে আমি আদৌ বন্ধ করতে রাজী নই, মনের জানলাগুলোতে আমি কিছুতেই পাল্লা দিতে দেব না। যত ধুলো আর ধোঁয়া ঢুকুক আমি আমার প্রাণের দরজাগুলো খুলে রাখব, না খুলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করব। কারণ জীবন্মৃতের দলে নাম লেখাতে আমি আদৌ অরাজী।

প্রগল্‌ভতাকে যাঁরা প্রহার করতে উদ্যত আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। হতে পারে আমাদের ঐতিহ্য যোগী, ঋষিদের; সম্ভবতঃ মৌন সাধনাতেই সিদ্ধির শিরোপা মেলে। কিন্তু জীবন কলের জলের মতো পরিচ্ছন্ন কিছু নয়—আসলে জীবন পঙ্কে-পুণ্যে গঙ্গাধারারই সগোত্র। সে জল তৃষ্ণার্তকে তৃপ্তি না দিলেও তাপিতকে স্বস্তি দেয়। এবং বাহুল্য জেনেও বলি, গঙ্গায় ডুব দিলে পুণ্য হয়; সে পুণ্য ইহলৌকিক পারলৌকিক উভয়ত।

এ সংসারে যাঁরা কোলাহলকে অপছন্দ করেন, যাঁরা মনে করেন সর্বনাশা, সবিনয়ে বলি তাঁরা বার বার সংসারকে শ্মশান বলে ভুল করেন। আসলে শ্মশান আদি নয়, অন্ত। সংসারের সীমা যেখানে শেষ সেখান থেকে শ্মশানের সুরু। সুতরাং শ্মশানের শান্তি সংসারে অসম্ভব। সে সোনার পাথর বাটি।

বিজ্ঞজনরা এ সত্য বোঝেন না তা নয়, তবু তাঁরা খবরদারীর তলোয়ার ঘোরবেনই, কারণ তাঁদের ভাব-ভাবনা বহতা নয়। তাঁরা বুঝতে চান না যে জীবনের একমাত্র তুলনা বহমান নদী, যার একই জলে দু বার স্নান করা যায় না। তাঁরা অবুঝের মত নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে পরবর্তীদের উপর চাপাতে বদ্ধ পরিকর। ফল হয় সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ জীবন মান্ধাতাই কোন ছাঁচ নয় যাতে ঠেলে ঠুলে ঢুকিয়ে দিলেই নির্দিষ্ট একটা রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। আসলে জীবনের ছাঁচ নিয়ত পরিবর্তনশীল। গতদিনের সঙ্গে আজকের মিল নিতান্তই নগণ্য। যেটুকু মিল সেটুকু শুধুই অবয়বে, অন্তরে নয়।

মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ এখন প্রত্নতাত্ত্বিকের আগ্রহের বস্তু, বাদশাহদের দিল্লী ঐতহাসিকের। এমন কি সেদিনের চার্ণকের কলকাতাও একালে প্রায় রূপকথা। এখন অরণ্য-আশ্রম আর কোথাও নেই, সর্বত্রই বাসাবাড়ী। গ্রামকে ক্রমে গ্রাস করছে শহর। ফলে সবাই আমরা উদ্বাস্তু, ভাড়াবাড়ির বাসিন্দে। শেকড় মাটি ছোঁবার আগেই প্রয়োজনে বাসা বদল হচ্ছে। প্রতি-নিয়ত অস্থির একালের জীবনে বিশ্বাসের অথবা ধ্যানের স্থিরতা কি করে সম্ভব আমি বুঝিনে। তাই কোলাহল স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলেই স্বাগত। তার

মুখে পাথর চাপা দেবার চেষ্টা অনেকটা সমুদ্রে বাঁধ দেবার মতই অবাস্তব। তাকে তিরস্কার করার অর্থ অনাবশ্যক কালক্ষয়। তাতে জীবনের গতি ব্যাহত হবে, আমরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ব। এবং একালে পিছিয়ে পড়ার অর্থ সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ হতে না দেওয়া।

জাপানী বামন বৃক্ষ যদিও বৃক্ষেরই সগোত্র, কিন্তু যথার্থ বৃক্ষ বলতে যা বোঝায় তা নয়। সীমার মধ্যে তার শোভনতা যদিও নূ ন নয়, কিন্তু প্রয়োজনে তার আস্বাদ ভিন্ন। বামন বৃক্ষের ফলে চোখের তৃপ্তি হ'ত বা সম্ভব, কিন্তু ভোগের তৃপ্তি নৈব নৈব চ। কারণ বৃক্ষের অনুপাতেই ফলের আয়তন, বলা যাক আয়োজন। জীবনের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। আমরা যদি নিজেদের সংস্কারের জালে নিজেদের সঙ্কুচিত করি তাতে আমাদেরই ক্ষতি। কারণ সব বামনের পক্ষে সব সময়েই ত্রিপাদ ভূমির স্বত্ব দাবী সম্ভব হয় না। ফলে আমাদের সঙ্কুচিত চিন্তা-ভাবনা দিয়ে আমরা হয়ত সামান্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে পারি, কিন্তু জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে বিরাট রাজসূয়ের আয়োজন চলছে সেই পংক্তি ভোজে আমাদের ডাক কিছুতেই পড়বে না। আর যেখানেই রাজসূয়ের বিপুল আয়োজন সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা কি রীতিমত অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং কোলাহল জীবনেরই সহচর। সে প্রায় কায়ার অনুসঙ্গ ছায়ার মতই সারাক্ষণের সঙ্গী। কোলাহলহীন জীবন-কল্পনা অবাস্তব। সে হয় না। তাহলে প্রগলভতাকে ধিক্কার দিই কেন ?

হয়ত সুমিত নয় বলে! হবেও বা। কিন্তু সুমিতির ধারণা কি নিতান্তই আপেক্ষিক নয় ?

কৈশোরের প্রগলভতা প্রৌঢ়ের পক্ষে অশোভন ; যৌবনের বাচালতা প্রবীনকে মানায় না। সঙ্গত ভাবেই প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য কিশোরের মুখে অস্বাভাবিক, এবং প্রবীনের প্রাজ্ঞ উক্তি যুবকের পক্ষে বেমানান। কিন্তু এদেশে কৈশোরের প্রগলভতা ধিকৃত, যৌবনের বাচালতা নিয়ত তিরস্কৃত। ফলে কিশোরের চলনে প্রৌঢ়ের পাকামো, যুবকের ব্যবহারে প্রবীনের হিসেবীপনা। এ সমস্তই সর্বনাশা! কিশোরের পক্ষে কিশোর-সম্ভব কার্য-কলাপই স্বাভাবিক, যৌবনের পক্ষে পড়িমরি উদ্দামতা। কারণ তা স্বভাবজ বলেই সর্বনাশা নয়, সৃষ্টিশীল। একে বলগা পরাতে চেষ্টা করলেই ইঁচড়ে পাকবে। এবং সে পাকামো যে

আদৌ সুস্বাদু নয় ঘরে-বাইরের বিকৃত কৈশোর ও যৌবনই কি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় ?

মাৎস্যন্যায়

যেহেতু আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে আমি নিরন্তর অস্থির, আমার শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে আমারই দ্বিধা বিস্তর, সেহেতু জ্যোতিষ-বচনে আমার বিশ্বাস প্রায় অন্ধের মতো। বারম্বার মিথ্যে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিষের সম্মুখে হাত পাততে আমি অকুণ্ঠ, এবং 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' কলমে চোখ বুলন বাধ্যতামূলক। সম্প্রতি সে-ধারণা আরও জোরাল হয়েছে যখন দেখলুম আমার অস্থিরতা দ্বিধা শুধুমাত্র আমারই দুর্বলতা নয়, একটি জাতিও সেই একই অস্থিরতায় দ্বিধায় নিরবচ্ছিন্ন বিব্রত। নিরন্তর ছোটাছুটি করছে ঘরে ঘাটে, বুঝতে পারছে না তার কি চাই—শ্যাম না কুল ? নিরুপায় হয়ে আমারই মতো অদৃষ্ট নির্ভর হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য সে জাতি বাঙালী, আপাতত তার রাশি মীন। কারণ মৎস্যে তার পুষ্টি, মৎস্যে তার আনন্দ, মৎস্যে তার সুখ। এবং সাম্প্রতিক হৈ চৈ দেখে মনে হল, এই বাঙালীরা দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুই ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু বিনা মৎস্যে একদণ্ডও বুঝি বাঁচে না, বাঁচবে না। মৎস্য নিয়ে এই যে অরাজকতা একে মৎস্যন্যায় বলা চলে কিনা আমি জানিনা, তবে আমার ধারণা এই-ই মাৎস্যন্যায়। কারণ অরাজকতা অদৃশ্য নয়, এবং আত্মিক হতাহতের সংখ্যা অসংখ্য। এবং এই মৎস্য আন্দোলনেই একটি জাতির দেউলেপনার সমস্ত লক্ষণই সুস্পষ্ট। অতঃপর এই সম্মান ঐতিহ্যপুষ্ট জাতি সম্পর্কে বিদেশীর, ভিন্ন প্রদেশবাসীর যেকোন শ্লেষাত্মক, সম্মান-হানি কর তীব্র তীক্ষ্ণ তিক্ত উক্তিও স্বাগত, যেহেতু এদের পুষ্টি একান্তভাবেই মৎস্য নির্ভর।

হয়ত আমার বাক্য অপ্রিয়, হয়ত অনেকের উষ্মার কারণ হবে, কিন্তু

নিরুপায়, যেহেতু আমিও বাঙালী। এবং বাঙালী বলেই ভাবতে দুঃখ হয় আমার পুষ্টির সমস্ত উপকরণই সুলভ শুধু মেছোহাটায়। অথচ ভীষণ অবাক লাগে নিতান্তই মৎস্যাশী এ জাতি কি করে রামমোহন বঙ্কিম বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের মতো প্রতিভাধর পুরুষ-সিংহদের নিকট আত্মীয় হবার সৌভাগ্য অর্জন করল? সম্ভবতঃ সে-সৌভাগ্য অলৌকিক। নতুবা বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই, কারণ এঁদের সুস্থ চিন্তা-ভাবনা যদি একটি জাতিকে ন্যূনতম সমৃদ্ধিও উপঢৌকন দিয়ে থাকে সে জাতির পক্ষে যখন বিশ্ব-সংকট আসন্ন, আভ্যন্তরীণ ও প্রতিবেশী সমস্যায় স্বদেশ যখন নিদারুণ বিব্রত, তখন কিছুতেই একটি জাতি অতি তুচ্ছ মাছ নিয়ে ঘরে-বাইরে মেছোহাটার কোলাহল সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হত না। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার ঠাকুর্দা মাঝি, বাবার আয়ের উপকরণও মাছ নয়, এবং আমার মৎস্য-প্রীতি উল্লেখযোগ্য।

মরণকাল আসন্ন হলে ভোগেচ্ছা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। তখন রিপুদেরই পরম প্রতিপত্তি। আর প্রতিপত্তি কমলাকান্ত কথিত সেই সমস্ত কুক্কুর জাতীয় পলিটিশ্যনদের। বিদ্যাসুন্দরের ভাষায়, 'সে সমস্ত বোবাদের ইচ্ছা কথা ফুটে, খোঁড়াদের ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে, ইচ্ছা বটে ইচ্ছা বটে' ইত্যাদি। অতঃপর কমলাকান্তের ভাষায়—"আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুত গমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনের লালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামী প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্সওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহাদের পলিটিক্স নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো'! ইহাই তাহাদের পলিটিক্স! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।" দীর্ঘ চুরাশী বছর পরেও এদেশের কুক্কুর জাতীয় পলিটিশ্যনদের সম্বন্ধে আমি কমলাকান্তের সঙ্গে একমত। কারণ যে কোন হুজুগে যারা প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে তাদের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা আহম্মকী, সে নিরর্থক। অথচ একটি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন জাতি কি করে এদের করধৃত আমলকী হয়ে গেল ভাবতে বিস্মিত হই। এবং নির্দ্বিধায় বলি, এ অধঃপতন মর্মান্তিক। এর

চাইতে নিঃশেষ অবলুপ্তি নিঃসংশয়ে শ্রেয়। না, তার আগে যে দুর্বলতার সুযোগে আমাদের জাতীয় শরীরে কলি প্রবেশ করেছে তাকে স্পষ্ট করি।'

দৈন্য যখন সর্বগ্রাসী হয় তখন যে কোন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের গত কয়েক বছরের আন্দোলনের বিষয়গুলোই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক পয়সার আন্দোলন, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন থেকে সুরু করে সাম্প্রতিক মৎস্য আন্দোলন, সমস্তই যা-তা কেন্দ্রিক অরাজকতা। আসলে এ সমস্ত সমস্যার উৎস ঘর নয়, বাহির। উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচালে ঘরের শান্তি নষ্ট হয়, আন্দোলনের ফল ফলে না। কারণ মৌল-আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে। কলকাঠি নাড়ার ফাঁক ফাঁকির সমস্ত ব্যবস্থাই কেন্দ্র করছে, রাজ্য সরকার তাতে সায় দিচ্ছে এবং সার্থক করছে মাত্র। সুতরাং চোরাকারবারীকে শায়েস্তা করা, অথবা বিদেশী কোম্পানীকে বিনা খেসারতে রাষ্ট্রায়ত্ত করা, অথবা অন্য ভাষাভাষীদের উপর হিন্দী চাপান বন্ধ করা, বা উদ্বাস্তদের সুবিধেজনক পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা, কিছুই রাজ্য সরকারের হাতে নয়। অথচ আমাদের আন্দোলনের সবটাই ঘরে, কারণ বাইরে কথা বলবার কেউ নেই। অর্থাৎ কেন্দ্রে আমাদের অস্তিত্ব লুপ্ত। এই বিলুপ্তি আমাদের অক্ষমতা। এ অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্যই এখানের ঘোষ বোস রায়ের দল কখনো নিজেদের চালে আমাদের মাতিয়ে তুলেছেন, কখনও বা আমাদের উত্তেজনায় ওঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন। ওঁদের নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার এ এক চতুর খেলা। এতে সমূহ সর্বনাশ যদি কারও হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে আমাদেরই। আমরা, বাঙালীরা ভারতের বৃহত্তর রাজনীতি থেকে ক্রমে হটে হটে আজ ঘরের শান্তি-ভঙ্গে মরিয়া হয়ে উঠেছি। সাংস্কৃতিক জগতে আমাদের প্রভাব ক্রমশ খর্ব হচ্ছে, সামাজিক বৈষয়িক অধঃপতন লক্ষণীয়। কারণ ব্যর্থতা সংক্রামক। এবং এই সামগ্রিক ব্যর্থতায় আমরা আজ উদ্যমহীন, আমাদের সমস্ত উত্তেজনাই তাৎ-ক্ষণিকের। বলা বাহুল্য এই অল্পস্থায়ী উত্তেজনার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তিতে আমাদের মনোবল উধাও, আমাদের ধৈর্যধারণ ক্ষমতা স্তিমিত। বরং বলি আমরা স্বল্পস্থায়ী উত্তেজনার অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তিতে বিষগ্রস্ত। এবং এই অক্ষম রাজনীতিজ্ঞদের দম্ভজাত তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বিষমুক্তি যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে সমূহ বিনষ্টি অনিবার্য।

এই তাৎক্ষণিক উত্তেজনার আরেকটি গূঢ় কারণ অধিকারী ও অনধিকারীর ভেদলুপ্তি। এই ভেদলুপ্তির মূলে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র ও সর্বনাশা গণশিক্ষা। এর ফলে ভেদ ঘুচেছে সন্দেহ নেই, আমরা মানব-মূল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয়ও দিয়েছি সত্য, কিন্তু যে সমৃদ্ধ-শিক্ষার উত্তরাধিকার থাকলে শক্তি-সচেতনতা আসে, সুনির্দিষ্ট অধিকার চেতনা জন্মায়, বলা বাহুল্য আমরা একালের শতকরা নিরানব্বুই জনই তা থেকে বঞ্চিত। ফল হয়েছে এই, তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অধিকার-চেতনা অগভীর; অথচ গণতন্ত্রের সুবিধাবলীর যথেচ্ছ ব্যবহারে আমরা প্রায় শিশুর মত উদ্দাম; গণ-শিক্ষার সর্বনাশা সনদগ্রহণে ভিখিরীর মত অকুণ্ঠ।

এই যথেচ্ছ বিহার ও অকুণ্ঠার উৎস দায়িত্বহীনতা। এবং এই সমস্ত দায়িত্ব-হীনদের বন্ধ্যা-উত্তেজনাই সমাজের, জাতির সর্বনাশের কারণ। যার উচিত ছিল মজুরের কাজের খবরদারী করা, সে হয়েছে শ্রমিক নেতা; যার হওয়া উচিত ছিল বিল বাবু, সে হয়েছে অর্থনীতিজ্ঞ; এবং যার অধস্তন কেরানী হওয়া সাজে, সে হয়েছে শিল্প সমালোচক অথবা সাহিত্যিক, অথবা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এমনতর উত্তরাধিকারহীন ভূঁইফোড়দের রাজত্বে অরাজকতা প্রাত্যহিক হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য এই স্পুটনিকের যুগে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন তোলা প্রতি-ক্রিয়াশীলতার সামিল সন্দেহ নেই, এবং আমি জানি এমনতর মনোবৃত্তির ভাগ্যে তিরস্কারই লভ্য; কিন্তু নান্য পন্থা। নিজের উত্তরাধিকার-হীনতা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন উত্থাপন নিতান্তই অনিবার্য—যদিও ব্যতিক্রম আছে থাকবে, এবং সবিনয়ে বলছি আমি ব্যতিক্রম নই, এবং এ শুধু সমালোচনা নয়, যতই দুঃসহ হক, তবু আত্মসমালোচনা।

আমি আত্মসমালোচনায় অকুণ্ঠ, যেহেতু উন্নাসিকতা আমার অপছন্দ, যেহেতু আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে, আমার শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে আমারই দ্বিধা বিস্তর। এবং যথার্থ সমালোচনা নিঃসন্দেহে স্বাগত, কারণ স্বাস্থ্যকর। বলা বাহুল্য এ শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, একটি জাতি সম্পর্কেও সত্য। আপন শক্তির প্রচণ্ডতার প্রতি সর্বক্ষেত্রে অন্ধ-বিশ্বাস আত্মঘাতী। তা ছাড়া শক্তির প্রচণ্ডতা দীর্ঘদিনের অনুশীলনে অর্জন সাপেক্ষ, তার জন্যে প্রচুর ত্যাগ, বিস্তর মূল্য দিতে হয়। যে তাতে অরাজী তার সমূহ বিনষ্টি অনিবার্য। বাঙালীর আত্মশক্তিতে অন্ধ-বিশ্বাস প্রায় প্রবাদ। অথচ বাঙালী জানে না সেই প্রবাদের কাল মৃত, এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়ে তার কাঠামো মাত্র অবশিষ্ট। কারণ ক্ষয়রোধে তার

আলস্য এখনও কাটেনি, তার প্রমাণ শাকান্ন-ভোজী এ-কালের অপুষ্ট বাঙালী এখনও বিগত দিনের ঘৃতের ঢেঁকুর তুলতে পঞ্চমুখ। আসলে এই পঞ্চানন-বৃত্তি আজকের শক্তি প্রমাণ করে না, প্রমাণ করে বিগত সমৃদ্ধির। এবং বিগত দিনের সমৃদ্ধশালী জমিদারের উচ্ছন্নে যাওয়া দেউলে পৌত্র আর যাই-ই হোক জমিদার নয়, সমৃদ্ধও নয়। বরং সেই হতভাগ্যের প্রাপ্য মর্যাদা তিরস্কার। সে তিরস্কার ইতরোক্ত হলেও বিস্ময় বাহুল্য, যেহেতু ইতরজনও উদ্যমী, সক্ষম; কিন্তু দেউলে পৌত্র জীবন্মৃত। তার উদ্যম অবসিত, তার অক্ষমতা ব্যাপক। আমাদের অবস্থাও অনুরূপ, ফলে চতুর্দিকের উচ্চারিত তিরস্কারে আমরা বিব্রত।

আসলে বাঙালীর উনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক সমৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে প্রায় রূপকথা। একালের আমরা কোনমতেই তার উত্তরাধিকার দাবী করতে পারি না। কালের ঘাড়ে দোষ চাপান নিরর্থক, যেহেতু আমাদের ব্যর্থতা মহৎ উদ্যমজাত নয়; যেহেতু আমাদের বিশ্ববোধ সঙ্কীর্ণ হতে হতে ক্রমশ ঘরে, না ঘরে নয়, রান্নাঘরে এসে ঠেকেছে। এবং আমরা আঁচলের তলায় দাঁড়িয়ে নির্ভীক বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়ে চলেছি। এতে বাইরের বাহবা অসম্ভব হলেও ঘরের লোকের উৎসাহ থেকে বঞ্চিত হব না, এ বাজি রেখেই বলা যায়। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, এও কম কি? নিশ্চয়ই কম নয়, কারণ বামাচারে আমাদের নিষ্ঠা তর্কের অপেক্ষা রাখে না, এবং আদ্যাশক্তির সুস্মিত বরে আমাদের ধন্য হতে লজ্জা নেই; বরং বলা যায় এই-ই আমাদের ঐতিহ্য। ঐতিহ্য বলেই হয়ত আমাদের আন্দোলনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সদর ডিঙিয়ে একেবারে অন্দরে এসে ঢুকে পড়েছে। এ ভালই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যতদূর জানি বামাচারীদের সাধনক্ষেত্র সমাজ নয়, শ্মশান। এবং তাদের সাম্প্রতিক দাপট দেখে এ সিদ্ধান্তে আসা কি খুবই অন্যায় হবে যে, আমরা সত্যই শ্মশানে আছি? অথচ আশ্চর্য! প্রাত্যহিক কোলাহল আর দৈনন্দিন ব্যস্ততা দেখেশুনে কিছুতেই মনে হয় না, কলকাতা একটি মৃত নগরী, আর পশ্চিমবঙ্গ একটি বিস্তৃত শ্মশান।

সংগৃহীত তথ্য ও উদ্ধৃতি কণ্টকিত যে বাক্ স্কন্ধকে সচরাচর 'প্রবন্ধ' বলা হয় এগুলো তা নয়; 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে'র অত্যাধুনিক লঘু-চালও সুলক্ষ্য নয়; বরং এগুলোকে যথার্থ অর্থে 'রচনা' বলা যায়,—যেহেতু এগুলোতে নির্মিতির স্বাক্ষর বর্তমান, এবং স্বল্প পরিসরে লেখকের ধ্যান ধারণা ও ভঙ্গীর প্রকাশ সুস্পষ্ট।

না, তার চেয়ে বলি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ এ গ্রন্থের অনুপম রচনাগুচ্ছ সম্ভ্রান্ত বাঙলা গদ্যভঙ্গীর এক বিচিত্র প্রদর্শনী।